প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

093.7
P.926 M
Vol. 60

093.7
P926M
vol. 60

VOL-60

1990-91

৬০

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

১৯৯০ যুগ্ম সংখ্যা ১৯৯১

PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY
Bought
10 AUG 1992
CALCUTTA

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক
স্বরাজব্রত সেনশর্মা কাজল সেনগুপ্ত
প্রকাশনা সচিব যুগ্ম
প্রতীক মিত্র চন্দ্রাণী মজুমদার
সম্পাদক
শিলাদিত্য সরকার জয়ন্ত রায়

প্রকাশনা বিষয়ে কিছু কথা

অনেক প্রতিকূলতা, বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে পত্রিকা প্রকাশিত হল। এই প্রথম হয়ত দুবছরের পত্রিকা একসঙ্গে প্রকাশিত হল। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। দেরী হওয়ার দায়বদ্ধতা অস্বীকার করছিনা কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু কথা বলার আছে।

পত্রিকা খাতে যা টাকা বরাদ্দ খরচের তুলনায় তা খুবই কম। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য কলেজ এত বিজ্ঞাপন যোগাড় করে যে এখন বিজ্ঞাপন পাওয়াই বেশ কষ্ট সাধ্য, কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন বরাদ্দ টাকা বাড়ানোর চেষ্টা করেন।

আর একটি কথা না লিখে পারছিনা। ছাত্রছাত্রীদের লেখায় উৎসাহ এবং মান দুইই দিন দিন কমছে। এ ব্যাপারটা খুবই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কি হল প্রেসিডেন্সির ?

প্রতিবেদন শেষ করার আগে তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই যাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি। সুমন, সাকিনা, অর্জুনদের সাহায্য না পেলে এ পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হত না। এছাড়া বিজ্ঞাপন এনে দিয়ে পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেছে অনেকে।

পরিশেষে বলি আমার কলেজ জীবন প্রায় শেষ। ব্যক্তিগত ভাবে কলেজ থেকে যা পেয়েছি তার তুলনায় কিছুই হয়ত দিতে পারিনি। প্রথম দিকে পত্রিকা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করলেও অনেক কিছুই বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তবুও যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলের জন্য আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ

প্রতীক মিত্র
প্রকাশনা সচিব ১৯৯০

চন্দ্রাণী মজুমদার
প্রকাশনা সচিব ১৯৯১

সম্পাদকের দপ্তর থেকে

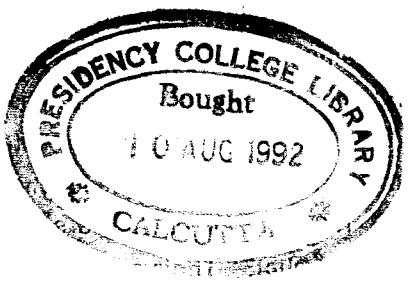

অনীহা, অনিচ্ছা, স্বপ্নপতন এবং ছন্দপতন। দিনে দিনে একা হতে হতে হারিয়ে যাওয়া। বৈষম্য এবং বৈসাদৃশ্য। পৃথিবীর বিশাল ক্যানভাস জুড়ে আপাতত বর্তমানে বিশাল অদলবদল। এতে কেউ কেউ মুহ্যমান, হতাশ কেউবা, কারো কারো আগে থেকে কুঁচকে ওঠা ভুরু আরো সংকুচিত। একদা প্রেসিডেন্সি কলেজের দৃপ্ত চলনে বাইরের পৃথিবীর শ্যাওলা এসে লেগে, এখানেও এখন পরিবেশ মলিন থেকে মলিনতর তাই শুধুমাত্র নাম ভাঙিয়ে বেঁচে থাকার গ্লানি নিয়ে প্রেসিডেন্সি আপাতত নিথর ও নিশ্চুপ। কবিরা বাকরুদ্ধ অথবা দ্বাররুদ্ধ, মিছিলে মুখ নেই, বহর বেড়েছে শুধু ক্যান্টিনের, দুটো ঘর উপচে ভিড় এখন লাগোয়া ক্যান্টিন বারান্দার কোণ এবং কর্ণারে। মেরিট্রোকোসির পীঠস্থান (?) নম্বর-সর্বস্ব গড্ডালিকায় কি পর্যবসিত ? —যদিও এখনও রয়ে গেছে ভাঙা ঐতিহ্যের ঘেরা-টোপে প্রেসিডেন্সিকে নিয়ে স্পর্শকাতরতা আর ধীরে ধীরে বাইরের পৃথিবীর টালবাহানার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে কলেজের আনাচে কানাচে—যার প্রকাশ বর্তমান চিন্তা ভাবনা এবং সংস্কৃতি চর্চায়। সত্যি কি তবে উচ্ছলল মুখগুলি হারিয়ে গেলো এই মুহূর্তের কলেজের নৈর্ব্যক্তিক মুখ-অভিনয়ে ? তবু বোধহয় কেউ কেউ থেকেই যায়। বর্তমান ছাত্রবন্ধুদের কেউ কেউ এগিয়ে এসেছিলো উৎসাহে, বাধা মেনেও ম্যাগাজিন প্রকাশ উপলক্ষ্যে। এদের ব্যতীত বর্তমান ম্যাগাজিন প্রকাশ হতো কি না সন্দেহ। নাম করলে প্রথমে করতে হয় শাশ্বত ঘোষের—যার একার উপস্থিতি এই ম্যাগাজিনের পিছনে অনেকের চেয়ে বেশী। দূর থেকে চেনা যাদের সেই সাকিনা, সুমন, অর্জুনদের কাছেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে রাখলাম।

দুঃখের বিষয় লেখা এবার এত কম জমা পড়েছিলো যে গ্রহণ বর্জনের মানদণ্ড আমরা সকলে মিলেই খুব বেশী উচ্চগামী করতে ভরসা পাই নি—করলে ম্যাগাজিনের কলেবর লিফলেটের মতন হয়ে যেতো। সব থেকে বেশী অভাব ছিলো কবিতা এবং গল্পের, যা হাতে এসেছিলো তা দিয়ে স্থান ভরানোর চেষ্টা করা হয়নি। সৌভাগ্য যে একেবারে শেষ দিকে শীত-ঘুম কাটিয়ে ওঠা লেখকদের কিছু ভালো লেখা জমা পড়ে—সেগুলিকেই জুড়ে একটা সাযুজ্য তৈরীর প্রয়াস করা হয়েছে—কেমন হলো তার বিচার এবং সমালোচনার দায়িত্ব রইলো বর্তমান ছাত্রবন্ধুদের উপর।

শেষ করার আগে আর একটা কথা—এবারের ম্যাগাজিন প্রকাশে জড়িয়ে নেই শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছাত্রীরা। কলেজের বাইরের দুজন ব্যক্তির সাহায্য এবং উপদেশ স্মরণযোগ্য। সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ-যোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে। দ্বিতীয় জন সুমিত চট্টোপাধ্যায় যিনি নিজে শুধু সময় ব্যয় করেন নি ম্যাগাজিনের জন্য, লে আউট, কলাম প্যাটার্ণ করার উপদেশ দিয়ে আমাদের সাধুবাদ কুড়িয়েছেন। এমনকি শেষ মুহূর্তের পরিকল্পনা সত্যজিৎ রায়ের প্রতিকৃতির বিষয়েও পেয়েছি শিল্পী গৌতম বসুর আন্তরিকভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হাত। এসবের জন্যই কৃতজ্ঞতা রইলো।

শিলাদিত্য সরকার

From the Editor's Desk

Life is nothing if not a conglomeration of some few stray and rare moments, moments that are inspired, effulgent in sheer intrinsic charm. Such 'moments' are the climactic acts which is otherwise mundane. Even the 'laws' are pregnant with possibilities, for then one reflects, ratifies and recoups. The famed 'Presi magic' can wholly be ascribed to Presidency providing each of its students with such moments galore. Highs and lows, exultations and depressions, follow each other in tumultous fashion in the daily campus experience, thus setting the intensity of life a good few notches higher here than anywhere else for a Presidencian. The memories linger on, harping mostly on those watersheds of intense experience, and so the adage, 'Once a presidencian, always so.....'. Life here is wholly uninhibited, the reactions spontaneous, emotional empathy among friends absolute. 'Milieu' brings each year a whiff of festive air, resurrecting crumpled spirits off curiculum and routine. Its our very own spring festival, taking off the sterile curses and rendering life fertile. It's our Feast of Lupercal. Only it no longer is held in spring.

The magic is subtle, wounding around you surreptitiously till you ate hopelessly enmeshed so it is with us, long out of the students' register but yet shrouded in nostalgia with four 'Milieus' and several hundred canteen-hours behind us, we have inculcated an in sight into the presidencian psyche. This has undergone a virtual metamorphosis of late. There is very little "pseudo" anything about the modern presidencian. The best products of an otherwise degenerate 'yuppy' culture, they stagger you with their forthrightness and shocking candour. Nothing, for them, is sanctified, nothing too derelict. Their searching probe, generously laced with bemused contempt, would delve into and deride anything this side of Hades. Dooning lalest designer jeans and sneakers, they talk hard rock, amble down the aisle with a tell-tale yankee swagger, and the dream of an American University rules the roost.

Transience. It provokes the intellect to probe deeper into things, and into their inner working. So much water flowed under the bridge...total decimation of the communist bastions, the gulf war and Saddam, the Mondal Commission ; ousting of the Romanian dictator as public indignation burst forth in one full sweep on a certain December of destiny. Mutability seems to be the password of existence.

Yet, "God fulfilleth Himself in so many ways,". We, the weak can only pray.

JAYANTA RAY

অর্জুন সেনশর্মা
শোকের বুদ্বুদ না অশোক সমুদ্র ? বল মা দাঁড়াই কোথা ? ১
অদ্রীশ বিশ্বাস
রতনকিশোর, সাহস সঞ্চয়ের উপদেশসহ রবীন্দ্রজীবনীচিত্র ৪
সুপ্রতিম সরকার
অথ সংস্কৃতি কথা ১২
রাজর্ষি দাশগুপ্ত
সর্বনাশকালীন অতীত কাতরতা ১৪
যশোধরা রায়চৌধুরী
কথোপকথন ১৭
বিবেক সেন
আমার প্রেমিকার জন্য : ইডিপাস ও অন্যান্য রচনা ২৩
তিতাস মিত্র
চোখের আলোয় দেখেছিলাম ২৫
ঈশানী দত্তরায়
অস্পৃশ্যস্পৃশ্য ২৭
আরোগ্য ২৮
অর্পণ চক্রবর্তী
কয়েক ফার্লং জুড়ে ২৯
প্রিয়াংকা চৌধুরী
স্বপ্ন দেখেছি আমিকে ২৯
সুমন ভট্টাচার্য
জানি না ৩০
অচ্যুৎ মণ্ডল
হাট ৩১

Tathagata Chatterjee
Towards cleansing of the debt-ridden third world augen stables : Some alternative solutions 32
Soumya Bhattacharya
Passion of the brush 40
Subhodeep Ghosh
A winter-nights retrospection 44
Prof. Ashok Mustafi
Kiran Sankar Roy : Some centenary reflection 45
Debraj Bhattacharya
The 21st century : USA as the hegemon ? 52
Sunandan Roy Chowdhury
Asia before Europe : A review 66

প্রচ্ছদ শিলাদিত্য সরকার
প্রচ্ছদ মুদ্রণ প্রিন্টিং আর্টস ৩২এ পটুয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
মুদ্রণ তরুণ প্রিণ্টার্স ২৯ কলেজ ষ্ট্রীট কলকাতা ৭৩

Past Editors & Secretaries

YEAR	EDITORS	SECRETARIES
1914-15	Pramatha Nath Banerjee	Jogesh Chandra Chakravarti
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta	Prafulla Kumar Sircar
1917-18	Saroj Kumar Das	Ramaprasad Mukhopadhyay
1918-19	Amiya Kumar Sen	Mahmood Hasan
1919-20	Mahmood Hasan	Paran Chandra Gangooli
1920-21	Phiroze E. Dastoor	Shyama Prasad Mookerjee
1921-22	Shyama Prasad Mookerjee	Bimal Kumar Bhattacharya
	Brajakanta Guha	Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Uma Prasad Mookerjee	Akshay Kumar Sarkar
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta	Bimala Prasad Mukherjee
1924-25	Subodh Chandra Sen Gupta	Bijoy Lal Lahiri
1925-26	Asit K. Mukherjee	
1926-27	Humayun Kabir	Lokesh Chandra Guha Roy
1927-28	Hirendranath Mukherjee	Sunit Kumar Indra
1928-29	Sunit Kumar Indra	Syed Mahbub Murshed
1929-30	Taraknath Sen	Ajit Nath Roy
1930-31	Bhabatosh Dutta	Ajit Nath Roy
1931-32	Ajit Nath Roy	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Nikhilnath Chakravarty	Girindra Nath Chakravarti
1934-35	Ardhendu Bakshi	Suddir Kumar Ghosh
1935-36	Kalidas Lahiri	Prabhat Kumar Sircar
1936-37	Asok Mitra	Arun Kumar Chandra
1937-38	Bimal Chandra Sinha	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Pratap Chandra Sen	Abu Sayeed Chowdhury
	Nirmal Chandra Sen Gupta	
1939-40	A. Q. M. Mahiuddin	Bimal Chandra Dutta
1940-41	Manilal Banerjee	Prabhat Prasun Modak
1941-42	Arun Banerjee	Golam Karim
1942-46	No Publication	
1947-48	Sudhindranath Gupta	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Subir Kumar Sen	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Dilip Kumar Kar	Sourindra Mohan Chakravarti

1950-51	Kamal Kumar Ghatak		Manas Mukutmani
1951-52	Sipra Sarkar		Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Arun Kumar Das Gupta		Jyotirmoy Pal Chaudhuri
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta		Pradip Das
1954-55	Sukhamoy Chakravarty		Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Amiya Kumar Sen		Devendra Nath Banerjee
1956-57	Ashok Kumar Chatterjee		Subal Das Gupta
1957-58	Asoke Sanjay Guha		Debaki Nandan Mondal
1958-59	Ketaki Kushari		Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Gayatri Chakravarty		Rupendra Majumdar
1960-61	Tapan Kumar Chakravarty		Ashim Chatterjee
1961-62	Gautam Chakravarty		Ajoy Kumar Banerjee
1962-63	Badal Mukherji Mihir Bhattacharya		Alok Kumar Mukherjee
1963-64	Pranab Kumar Chatterjee		Pritis Nandy
1964-65	Subhas Basu		Biswanath Maity
1965-66		No Publication	
1966-67	Sanjay Kshetry		Gautam Bhadra
1967-68		No Publication	
1968-69	Abhijit Sen		Rebanta Ghosh
1969-72		No Publication	
1972-73	Anup Kumar Sinha		Rudrangshu Mukherjee
1973-74	Rudrangshu Mukherjee		Swapan Chakravarty
1974-75	Swapan Chakravarty		Suranjan Das
1975-76	Shankar Nath Sen		
1976-77		No Publication	
1977-78	Sugata Bose Gautam Basu		Paramita Banerjee
1978-81		No Publication	
1981-82	Debasis Banerjee Somak Ray Chaudhury		Banya Datta
1982-83		No Publication	
1983-84	Sudipta Sen Bishnupriya Ghosh		Subrata Sen
1985-86	Brinda Bose Anjan Guhathakurta		Chandreyee Niyogi
1986-87	Subha Mukherjee Apurba Saha		Jayita Ghosh

1987-88		No Publication	
1988-89	Anindya Dutta		
	Suddhasatwa Bandyopadhyay		Sanchita Bhowmick
1989-90	Abheek Barman		
	Amitendu Palit		Debashish Das
	Adrish Biswas		
1990-91			Pratik Mitra
	Jayanta Ray		
	Shiladitya Sarkar	Jt. Publication	
1991-92			Chandrani Majumdar

With best compliments from :

ICB Limited

Engineers & Constructors

Regd. office : 168 Vidyanagri Marg
Kalina, Bombay—400 098
Gram : KONBURO, Phone : 6123572
Telex : 71330 icb in & 78061 icb in

Regional office : Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi-110 002
Gram : KONBURO, Phone : 3316819
Telex : 65904 icb in
8 Camac Street, 4th Floor, Suite No. 3
Calcutta-700 017
Gram : KONBURO, Phone : 22-8035 Fax : 22-3200
Telex : 2479 icb in

With best compliments from :

Sarat Book House

শোকের বুদ্বুদ না অশোকসমুদ্র ?
বল মা দাঁড়াই কোথা ?

● অর্জুন সেনশর্মা
বাংলাবিভাগ, প্রথমবর্ষ

১. O, Phoebus, from your throne of truth
From your dwelling place at the heart of the world ;
you speak to men.
By Zeus's decree nolie comes there,
No shadow to darken the word of tuth.
[Homeric Hymn
from
'Mythology' by Edith Hamilton]

২. আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাসন্তি তথৈবান্যে ইতিহাস মিমং ভুবি ॥

কোন কোন কবি এই ইতিহাস পৃথিবীতে পূর্বে বলেছিলেন, কেউ কেউ সম্প্রতি বলেছেন, ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন।

৩. রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন।
কঠিনেরে ভালো বাসিলাম।
[রবীন্দ্রনাথ]

৪. "...the truth is cruel, but it can be loved and it makes free those who have loved it."
[স্পিনোজা]

অত্যন্ত স্বগত প্রদত্ত চারটি উদ্ধৃতির মধ্যে সচেতন একটি সংযোজনা সন্ধান করা দুরূহ নয়। গ্রীক মহাকবি তাঁর জাতি ও সমাজের লোকপুরাণের সত্যাশ্রয়ী কাহিনীকে মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং সুললিত শব্দোবদ্ধ গাথায় যে গীত রচনা করেন তা কবিরা পূর্বে বলেছিলেন এবং পরে বলবেন বলেই হয়ত নির্দিষ্ট নিদেশতন্ত্রাবলী দ্বারা আবদ্ধ বা বিচার্য নির্বিশেষ সত্যের চিন্তন ও মনন সময়োচিত হয়ে পড়ে। শিল্প কখনোই প্রগতির পথে অগ্রসর হয় না—সময়ের এই ধারণায় আধুনিকতার কোন অগ্রজপ্রতিম তাত্ত্বিক কবি যখন স্থিতপ্রজ্ঞায় এসে উপনীত হন তখন সমর্থন জানাতে বাধ্য হই এই ভেবেই যে শিল্পেরই অঙ্গাঙ্গী সময়, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ বিধৃত সময় অচল এক নিশ্চেতন স্থিতিজাড্যে ভুগে চলে। ফলতঃ নির্ভেজাল উত্তরাধিকারের পরিবর্তে ধারাটি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়, অনেকটা নিঃসময় বিষয় সমুদ্রে মুক্তার মত চয়নযোগ্য তাৎক্ষণিকতা নিয়ে বেঁচে থাকি। তথাকথিত স্থির অতীতের সজ্জাকে, পারিবারিক গোত্রইতিহাসকে, পরিবর্তিত করার সাধ্য কোন নির্দিষ্ট মানব-মণীষার যদি থাকেই তবে সেই পরিবর্তন হয় ভবিষ্যৎমুখী এবং সার্বিক। অর্থাৎ ভাবী বংশধর যখন দৃষ্টিপাত করে তখন সজ্জাকে নতুনতর বলে মনে হতেই পারে এবং তৎসহ সেখানে একটি সংকটের আশংকা থেকেই

যায়। নবীন যখন তার বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিগত ও জাতিগত অতীত কে বিচিত্র আকার দিতে দ্বিধা করে না, পরিণামে একদিন দোলাচলতা নেমে আসে সত্যান্বেষণে।

ফলে ঘটে যেতে পারে স্বাধীনতার আড়ালে এবং সুযোগে সত্যের অপলোপ। অথবা তৈরী হতে পারে বৃহৎ প্রতিক্রিয়াশীল কোন গহ্বর যেখানে ছদ্ম সত্যের রূপ ধরে মিথ্যা আড়ালে লুকোতে চায়।

এ যাবৎ লিখিত পরিশ্রম সাধ্য এই নান্দনিক যোগ-ব্যায়ামে শুধু এই টুকুই আমার বোঝানোর উদ্দেশ্য ছিল যে, ধারণা যখন বিচার প্রবণ হতে বাধ্য তখন এমন একটি অবস্থান গ্রহণই কাম্য হবে যেখান থেকে ঘটমান বর্তমান ও তার সম্পূর্ণ প্রেক্ষাটিকে অনুধাবন করা সহজতর হয়ে ওঠে। সুতরাং গঠন করতে হয় ত্রিস্তর এক নির্দেশ তন্ত্রের যার মাধ্যমে সহজ হয়ে যায় বিশাল প্রশ্নচিহ্নের কাছাকাছি হওয়া। এক্ষেত্রে দোলায়িত প্রজন্ম যখন নিজস্ব অবস্থানের জন্য আর্ত হয়ে ওঠে তখন অক্ষত্রয়ের চিহ্ন নিম্নরূপ হয়ে যায়।

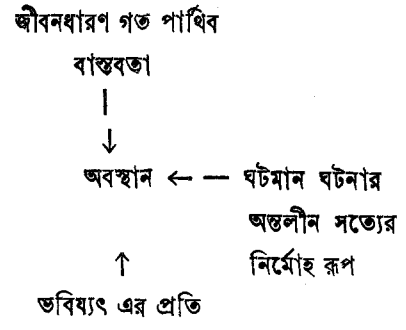

নির্দ্দিষ্ট অবস্থানটিকে যদি আমরা মূলবিন্দু ধরি, সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হয় অন্য তিনটি অক্ষের মৌলিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। একটি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সমস্যায় আমার অবস্থানের নির্মিতি তৈরী হয়ে যায় ইতিহাস গত সততা ও বর্তমান পৃথিবীর জটিল পরিস্থিতিতে গৃহীত পদক্ষেপ ভবিষ্যতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তারই পরিমাপনে। আগের ত্রিস্তর চিত্রের অনুভূমিক বিন্যাসে যে গুরুত্বটি দিয়েছিলাম "ঘটমান ঘটনার অন্তর্লীনে সত্যের নির্মোহ রূপ" বলে, তার বিচারও অতি সহজ নয় বলেই প্রয়োজন হয় অনুরূপ এক পথ নির্দেশ।

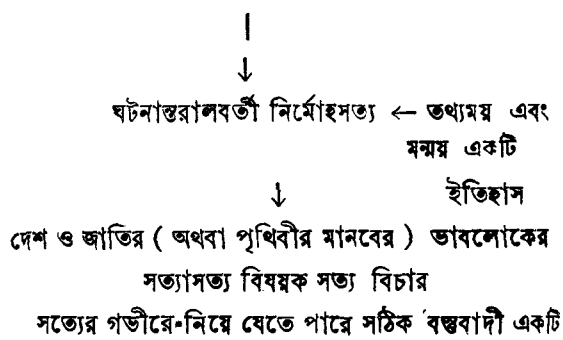

সত্যের গভীরে-নিয়ে যেতে পারে সঠিক বস্তুবাদী একটি ইতিহাস দ্বারা, তাকে পথ দেখাতে পারে বহতা ভাবলোক। কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠের ভাবলোক যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাব উচ্ছিতির বাহক সেক্ষেত্রে জাতীয় ভাব দ্বারা প্রতাড়িত না হয়ে তাকে প্রভাবিত করার মত অস্তির সাহস দরকার। অন্তর্লীন সত্যবিচারের গভীরে প্রবেশের জন্য অবশেষে পূর্বের মতই পার্থিব বাস্তবতাকে বিস্মৃত হলে চলে না। প্রগতির পথে পৃথিবীতে মৌহূর্তিক পরিবর্তন গুলির স্বীকরণ তখন তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। অবশ্য এই সময় "Art never improves' এই ধারণায় বিশ্বাস রাখা দুরুহ হয়ে পড়ে। Art এ যদি সত্তার সত্যদর্শনের ছায়াপাত ঘটেই এবং সেই সত্য তার অন্যতম নির্ভর—বাস্তব প্রেক্ষিতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বদলে যেতে বাধ্য তখন, Artও নিরন্তর প্রগতিতে ধাবমান।

ব্যক্তি কবি বাস্তবের অভিঘাতে ডুবে যান ভাবনার অতলে, অতীতের এ্যাবিস থেকে, ইতিহাসে আশ্রিত অনুরূপ ঘটনাসমষ্টি থেকে বা অতীতের রূপকাশ্রয়

থেকে তুলে আনেন প্রতীকাশ্রিত কোন বিশেষ সত্যমূর্তি। এরই সাহায্যে Imaginative writer এগিয়ে যান ভবিষ্যতের ইচ্ছাপূরণের (বিয়োগন্তক মিলনান্তক নির্বিশেষে) দিকে। দেখা গেল বাস্তবের হস্তক্ষেপে কবিস্রষ্টার শেষ সত্য নির্ধারিত হয়।

["We must assume, first of all, that cultural experience and indeed all cultural forms are historically, radically quint essentially, hybrid, and if it has been the practice since Kant to seperate the cultural and aesthetic realms from the worldy domain of polytics, it must now be time to rejoin them.

[Thirdworld Intellectuals of Metropolitan Culture]

বিভিন্ন মুখী এই বিচার ও বিবেচনা প্রয়োজন আজ আছে বলেই বিচিত্র এবং বহুধা বিচিত্র সত্য ক্রমশঃ মেরু বর্ণালীর মত দুর্গম ও দুষ্প্রবেশ্য হয়ে পড়ছে। ক্রমশঃ এ্যাম্‌বিগুইটি এসে যাচ্ছে, বলেই পরিষ্করণ চাই—এই দাবীতে আত্মসমর্পন না করেই বলব অদ্যকার ক্রমবর্ধনশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিল ক্ষেত্র নিচয়ে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য "প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধিজীবি চারিত্র্যকে গভীরতর ও প্রশস্ততর করা"(গ্রাম্‌শি) টিই উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ফলতঃ ব্যক্তি সত্তার একান্ত শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করেই মহৎসত্যের বিকাশ সম্ভব, এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস রাখাই বাঞ্ছনীয়।

রতনকিশোর, সাহস সঞ্চয়ের উপদেশসহ রবীন্দ্রজীবনীচিত্র

অদ্রীশ বিশ্বাস

সতেরোই ফেব্রুয়ারি বাড়ি আসার কথা ছিল, এল না। প্রায় দেড় মাস বাদে মার্চের শেষে যেদিন পুরোনো ডেট রফা করতে আমার বাড়ি এল রতন কিশোর, সেদিন আমি ক্লান্ত, শয্যাপ্রেমিক। রূপায়ণ, কালার ল্যাবরেটরিতে ছোটাছুটি—সেকেণ্ড ফ্লোর, টিং-টং, দাদা হবে? হেঁট মুণ্ড....গ্রাউণ্ড ফ্লোর, কাজ হয়নি। ক্যামেরা ভাড়া—যথেষ্ট অগ্রিম টাকা দিয়ে যাবার কথা ছিল, রতন কিশোর না আসায় সেটাও বাতিল হয়েছে। পাছে ক্যামেরা অন্যত্র ভাড়া চলে যায়, তাই ছুটে গিয়ে সমস্ত বুঝিয়ে এসেছি ক্যামেরা মালিককে। 'বৌদি চা—'। এসব ফিরিস্তি শুনে খাটে বসে সংকুচিত হয়ে পড়ল রতনকিশোর। তারপর ধীরে ধীরে অর্থহীনতা বুঝিয়ে বলে উঠল, 'ক্যান্সেল। ঐসব ইটভাটি-টিটভাটি নিয়ে ডকুমেণ্টারি চলবে না।' তাহলে কী? 'রবীন্দ্রনাথ'। ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে গলে যাওয়া কাঁচা ইটের মাটির ধারার মত ঘেমে উঠলাম আমি। রতনকিশোর চায় কী? 'রবীন্দ্রনাথ নিয়ে জীবনীচিত্র। ১৩০ বছর বয়স্ক, জাতীয় কবি, একটা বড় ছবি বানানো হল না তাঁকে নিয়ে। সত্যজিৎ রায় যেটা বানিয়েছেন তাতে রবীন্দ্রনাথকে চেনা যায় না। ধরা যায় না। কোথায় রবীন্দ্রনাথ, একদম ১০০% রবীন্দ্রনাথই, কোথায় সেই রবীন্দ্রনাথের খামতি, এসব দেখা হল না। খামতিগুলো তুলে ধর—প্রশ্ন কর—রবীন্দ্রমননটা তুলে ধর। মনে রাখতে হবে, মহান মানুষ, আবার মস্ত বড় বিরোধী শক্তিও। আক্রমণ কর—এভাবে না হলে হবে না। ইউ টেক দিস্ চ্যালেঞ্জ।' কিন্তু এতো প্রাসঙ্গিক ব্যাপার, চ্যালেঞ্জের কী আছে? 'আছে। তোমায় ছবিটা বানাতে দেবে না।' বিস্মিত। দেবে না কেন? ঐ আক্রমণ? ওসব রবীন্দ্রনাথের জীবনে বহু ঘটেছে। রতনকিশোর পা দুটো গুটিয়ে বসল। যেন আর কেউ ওকে চেষ্টা করলেও তুলতে পারবে না। 'আধুনিক ছেলে মেয়ে আমরা। বাই-দ্য-বাই, মেয়ে বলতে মনে পড়ল, মৌ কেমন আছে?' ভাল। 'ওকে আমার লাগতে পারে ছবিটার ব্যাপারে, গানে-টানে দরকার হবে হয়ত। কিন্তু বানাতে দেবে না অন্য কারণে। চার পাশে সাহসী লোক থাকলে বিষয়টা বুঝত। চ্যালেঞ্জটা নিত। তুমি নেবে?' আরে বাবা চ্যালেঞ্জটা কি বলবে তো? 'কাস্টিং। নামভূমিকায় অমরেশ পুরী। অন্য কাউকে ভাবাই যায় না।' বলে কি রতনকিশোর? সংসর্গ ছাড়াও হবে বুঝি এবার তার। কিন্তু তার আগেই বেশ প্রমাণ সাইজের একটা ফাইল এগিয়ে দিল আমার দিকে। সঙ্গে একটা চিঠি। বলল, 'যোগাযোগ অনেকদিনই হয়ে গেছে। তুমি কিছুই খোঁজ রাখ না তাই। প্রেস কনফারেন্সে কথা উঠবে, তাই, যুক্তিটুক্তি সব রেডি। এই ফাইলে। আসতে না পারার কারণ বুঝলে? হু-হুঃ! অ্যাডভান্স প্রপাগাণ্ডার জন্য অমরেশ পুরীর একটা ইণ্টারভ্যু চলে এসেছে। সমস্ত প্ল্যানটাই ফাইলে আছে। তুমি দেখে নিতে পার।' কিন্তু বিশ্বভারতী আটকাবে না? 'নো। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথ তদারকির মেয়াদ এ বছরই ডিসেম্বরে শেষ, ইউ নো। তারপরই শুরু হবে ছবি। এখন শুধু মানুষ চাই। অমরেশ পুরী ছাড়া ঐ রকম দানব প্রতিভাকে যে বোঝা যায় না, ঐ রকম স্তম্ভের মত মানুষ—সেই সাহসটা অর্জন কর তোমরা।'

অতঃপর দু'রাত সে ফাইল নিয়ে পড়ে থাকা আমার কাছে এক অভিজ্ঞতা, ভালবাসা। সেই ফাইল থেকেই নির্বাচিত যুক্তি সাজিয়ে দেওয়া যাক, রতনকিশোরের ভাষা,

চেষ্টা আর পরিকল্পনা মত। প্রথম পড়েছিলাম চিঠিটাই, যেটার মূল ভাষা ইংরাজী, নীল পাতলা ফিন্‌ফিনে হরফে টাইপ, প্যাডের উপর ডানদিকে আবছা বাদামী রঙ— অমরেশ পুরী, আমেরিকান টিন এজার গার্লের চেহারার সাদা কাগজে দ্রুত খুলতে গিয়ে ছিঁড়েছে অংশত—

ডিয়ার রটনকিশোর,

আপনার প্রস্তাবে সামনের বছর আমি শুটিং-এর তারিখ নির্বাচন করতে পারি, তবে দেখবেন গ্রীষ্মটা আসার আগেই

ভাব ব্যক্ত করবে, তার সহায়ক অংশ ঐ মুক্ত বা ফ্রি স্পেসটা। ভাবা যাক ১৮৯০-৯১ সালে লেখা খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, পোষ্টমাস্টার গল্পের কথা। যেখানে শৈশবকে হারানোর ব্যথাই চাকর আর পোষ্টমাস্টারের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে। দু'জনেই চাইছে সন্তানের মত দুই শিশুকে পূর্ণভাবে পেতে, কিন্তু পোষ্টমাস্টার রতনকে ফেলে চলে এসেছে। রাইচরণ খোকাবাবুর মৃত্যুর দুঃখে বিপর্যস্ত।

● ফাইল থেকে পাঠ্য যুক্তি, রতনকিশোর

মাছ ধরিবার সময় দেখা যায়, অনেক মাছ
যতক্ষণ বঁড়শিতে বিদ্ধ হইয়া জলে খেলাইতে
থাকে ততক্ষণ তাহাকে ভারী মস্ত মনে হয়,
কিন্তু ডাঙায় টান মারিয়া তুলিলেই প্রকাশ
হইয়া পড়ে যত বড়োটা মনে করিয়াছিলাম
তত বড়োটা নহে—

শোচনেবালাকে নিয়ে শোচো, আউর
সবকো ভিত্তর কর দো, শোচনেবালা
ইয়ে শোচে গা

যেন সব শেষ হয়ে যায়। ও সময়টা শীতের দেশে বেড়াতে যাই। আপনার ইচ্ছে মত বাসু চ্যাটার্জিকে গত সপ্তাহে সব রবীন্দ্রনাথের বইই ফেরত দিয়ে দিয়েছি। আপনার মেকাপ ম্যানকে বলে দেবেন, আমি মেকাপে শুধুমাত্র 'ওসমানিয়া অ্যাজহেসিক্'ই ব্যবহার করি। সামনের মাস-গুলোয় কি নিরামিষ খাব? ধন্যবাদ জানবেন।

—অমরেশ পুরী, বম্বে, মার্চ, ৯১

অমরেশ পুরী, আমাদের এ সময়ের উঠে আসা এমন একজন প্রতিভাবান অভিনেতা, যার উপস্থিতি আমাদের কখনোই অন্যমনস্ক করাতে পারে না। যতক্ষণ পর্দায়, ততক্ষণ একটা উপস্থিতির শেল মাথায়। আছি, আছি, উপস্থিত—আউর সবকো ভিত্তর কর দো। সিনেমা স্কোপ (৭০ মি. মি) কিম্বা ৩৬ মি. মি, যে পর্দাই হোক, একটা বিগ ক্লোজ আপে তাঁর স্পেস কভার করার ক্যাপা ৫১ ও ২৭ মি. মি বর্গাকার। অর্থাৎ ½ অংশ। সিনেমার ভাষায় 'ডেভিড ক্লোজ আপ্'। বাকি ১৭ ও ৯ মি, মি ফ্রি স্পেস-এ মিউজিকাল ইন্‌ট্রোডাকশন, রঙের দ্বৈততা। মুখ যে

সে সময় জন্ম গ্রহণ করছে কবির মেজ মেয়ে রেণুকা। এক-দিকে শিশুহারানোর কাহিনী তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, অন্যদিকে শিশুর পিতা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। এই দ্বন্দ্বমুখর সময়, ক্লোজ আপে পর্দা জুড়ে নীল আলোয় উঠছে অমরেশ পুরীর (রবীন্দ্রনাথের) মুখ আর আনন্দ-ভয় মাখা চারপাশ কুঞ্চিত চোখের অসীম দৃষ্টি। লক্ষণীয়, অমরেশ পুরীর চোখে সাদা অংশের পরিমাণ বেশি, ছোট আইবল থরথর কাঁপে, কি যে মন চায় বোঝা দায়—রবীন্দ্র মনোভাব ঐ-ঐ—

● দাড়ি

আমরা 'মাণ্ডি' আর তামিল ছবি 'কন্যা'য় অমরেশ পুরীকে দাড়ির মেকাপে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের মতই লম্বা দাড়ি, মাণ্ডি, ছোট বিক্ষিপ্ত। সাদা নেমে আসা গোঁফের উপর তর্জনীর মত পুরুষালি নাক, চওড়া কপাল। প্রায় সত্তর বছর বয়সে বের করছেন প্রেমের কবিতার সংকলন 'মহুয়া'। বিয়েতে উপহারের নিমিত্ত। অন্তর্গত

এই ভাব ব্যঞ্জনার জন্য ছবিতে দাড়িটা কালো হয়ে যাওয়া উচিত। কিম্বা ১৯২৭, ঐ সময়েই আর একটা বড় ঘটনা—আধুনিকতার নামে 'শেষের কবিতা'র মত একটা কাঁচা উপন্যাস লিখছেন। ঠিক একই রকম ত্রিকোণ প্রেমের কবিতা-উপন্যাস লিখেছিলেন মাণিক ব্যানার্জী। জীবনের প্রথম লেখা, 'দিবারাত্রির কাব্য'। কত পরিণত মনস্তত্ত্বর কথা সেটা। অথচ রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়। ও লেখাটার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই প্রতিবাদ জানানো উচিত। গোঁফ দাড়িটা দেখা যাবে না এ দৃশ্যটায়। প্লিজ, ক্ষমা করবেন (সাহস চাই)। তবে আর একবার দেখা যাবে দাড়িহীন ছবি। নাম্না, পিতৃবিয়োগের সময় নয়। এটা যথার্থই প্রতিবাদ। ১৯৩১, হিজলি বন্দি শিবিরে গুলি চালানোর প্রতিবাদে। তার আগে ১৯৩০ থেকেই এই প্রতিবাদগুলো লাগাতার ভাবে শুরু করেছিলেন। এতটা ধারাবাহিক সোচ্চারে আগে কখনো থাকেন নি। ১৯১৯, জালিয়ানওয়ালাবাগ। কিন্তু ১৯৩০, লবণ আন্দোলনে গান্ধী, নেহেরু গ্রেপ্তার হয়েছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার। রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে। বিদেশে বসেই একের পর এক বিদেশী পত্র পত্রিকায় ব্রিটিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখে চলেছেন। প্রভূত সাহস, ছমছমে খস্ খস্ পাতার আওয়াজে। ঐ বছরই সেপ্টেম্বরে রাশিয়া, অক্টোবরে আমেরিকা। ব্রেভো, (মনোবলটা ভাববার আছে) ঘাড় ঘোরালেই রাশিয়া, ঘাড় ফেরালেই আমেরিকা। এ দৃশ্য উপস্থাপনায় অমরেশ পুরী ছাড়া দ্বিতীয়র সন্ধান দিলে সম্বর্ধিত পুরস্কার, যার উভয় দিকই মুখের ব্যঞ্জনাকে তুলে ধরতে পারে। যেন দু' পিঠেই কথা বলে। রাশিয়ায় সেই হাসি, প্রফাইলে মুখের পাশে গাল বরাবর গভীর দুটো ভাঁজ অমরেশিয় ইয়ে, তারপরই হিজলি। হাই এ্যাঙ্গেল শট। আকাশের দিকে গলা তুলে চারিদিকে যেন কিছু খুঁজছেন (ইঙ্গিতটা অপরাধী ধরার স্পর্ধা) ডান দিক থেকে বাঁয়ে, আবার ডান দিকে আইবলটা, কাট্। ফকিরের ঐ দাড়িটা এ সময়ে নেই। গোঁফটা কিন্তু থাকছে।

● টুপি

জাপান যাত্রী। মাথায় কৌটোর মত নেপালি টুপি। বিলাতে গিয়েছেন, ঐ একই টুপি মাথায় (প্রমাণ ১২৫ জন্ম জয়ন্তীতে বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ১ম খণ্ডের ১৬০ পৃষ্ঠার ছবি 'বিলাতে রবীন্দ্রনাথ, ১২৯৭' দ্রষ্টব্য)। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা বিখ্যাত জাতীয় মহাসমিতির উদ্‌বোধনে (১৯১৭) ভাষণরত রবীন্দ্রনাথের ছবিটাতেও সেই টুপি। খয়েরী অন্ধকারের ভেতর দিয়ে উপরে ডানদিকের পেছন থেকে সাদা আর হলুদ মেশানো একফালি মঞ্চের আলো এসে পড়েছে সামনের দিকে। পিছন ফিরে, ভাষণ দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। টুপির কোনা বেয়ে আলো গিয়ে পড়েছে আবছা জনতার একাংশে। এই একই রকম টুপি ব্যবহার করতে দেখেছি আমরা অমরেশ পুরীকে 'গান্ধী' ছবিতে। আফ্রিকার পটভূমিতে। চমৎকার ভাবে খাপ খেয়ে গেছে সে টুপি। চারপাশ থেকে সাদা দাড়ির উপস্থিতিটা কল্পনা করে নিতে পারলে অসুবিধা হয় না গগনেন্দ্রনাথ কিম্বা হাফ কার্ভ করা জাপান যাত্রীর ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে।

● ত্বক, চোয়াল, গাল, ভ্রূ

তৈলাক্ত ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়ে না সহজে। রবীন্দ্ররচনাবলীর ঐ সংস্করণেরই সপ্তম খণ্ডের প্রবেশক আর ৯৩ পৃষ্ঠার 'তৃতীয়া' নামাঙ্কিত ছবি দুটি কিম্বা চতুর্থ খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠায় আনুমানিক ৪৫ বছর বয়সের ছবিটিও লক্ষ্য করলে স্পষ্ট দেখা যায়—তাঁর ত্বক তৈলাক্ত ছিল। শেষ ছবিটা অমরেশপুরী যুক্তিতে চমৎকার হাতিয়ার হিসাবে সক্রিয় হতে পারে। এই ছবিটার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের চোয়াল, চোখ, ভ্রু আর নেমে আসা থমথমে ত্রিমাত্রিক গাল থেকে একটা দৃঢ়, অভিজ্ঞ মানুষের রূপ। একটা ক্রূরতার ভাব। গালের জলতরঙ্গ-পাতলা ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, গায়ের পাঞ্জাবি, চাদর, চাঁদির চশমার বাঙালি শিক্ষকের রূপটিকে ম্লান করে দিয়েছে। বেরিয়ে এসেছেন, একটু বিব্রত, ক্ষুব্ধ একটা মানুষের ছবি—এ সবই অমরেশ পুরীতে সাবলীল,

'ধনা কেতনা দিন ও খো গিয়ারে? মুঝকো বুঢ়া লাগ্‌তা হ্যায়, মুঝকো শাদি দে দো', বাড়তি আছে ভাঙ্গী কণ্ঠস্বর থেকে উঠে আসা বিস্ফোভের চূড়ান্ত প্রকাশ। আর অবশ্যই তৈলাক্ত ত্বক (সূত্র, 'মুভি', অ্যান ইণ্টারভ্যু উইথ অমরেশ পুরী, ফুল সান ইন দ্য স্কাই, মার্চ সংখ্যা ১৯৮৬)।

● উদ্ধৃতি সহ রবীন্দ্রনাথ প্যারালাল ভাবে অমরেশ পুরী অংশত হুবহু

'তাঁর মতো দুরধিগম্য, যুগপৎ ভয় ও শ্রদ্ধার পাত্র, কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার জীবনে দেখেছি বলে স্মরণ হয় না ঘন ঘন তাঁর মন-মেজাজ বদলাত বলে তাঁর সহচরদের পক্ষে তাঁর খেয়াল খুশির সঙ্গে তাল রেখে চলা খুবই কষ্টসাধ্য হত।'

(পিতৃস্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ২১৯)

এই স্বভাবটি অমরেশ পুরীর সঙ্গে কিভাবে মিলে যায়, তা ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। হাসি ও ক্রূরতার (ভয় ও শ্রদ্ধা) মুহূর্মুহু সমন্বয় ঘটেছে তার অভিনীত অসংখ্য চরিত্রে। এই বিশেষ সূত্রেই, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, নানা খণ্ড দৃশ্যে। রবীন্দ্রনাথ যে প্রচণ্ড অত্যাচারি জমিদার ছিলেন তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের সঙ্গে যে সুপার ম্যান সাজার বৈশিষ্ট্যটা মিশে ছিল, জমিদারিতে সেটা সুন্দর ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। উদারতন্ত্রে আস্থাশীল ও নিয়মনিষ্ঠ, প্রয়োজনে কঠোর, শিলাইদহের জমিদার রবীন্দ্রনাথের এই চরিত্রটির বহু পরিচয় পাই তাঁর এস্টেটের ম্যানেজার শ্রী জানকীনাথ রায়কে লেখা পত্রাবলীতে (আশীষ: সন্ত—পত্রাবলী)। 'বাবাকে যেমন দেখেছি' অধ্যায়ে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের কর্তৃত্ব করার এরকমই একটা চিত্র—

"বাবা বললেন, তিনি যখন জমিদারির কাজ দেখতে আরম্ভ করেন প্রথমেই প্রজাদের মধ্যে সালিশি বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম—এই দুই পরগণায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে বিচার সভা স্থাপন করেন। প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ ঘটলেই উভয় পক্ষকে এই বিচার সভায় উপস্থিত হতে হবে এই নিয়ম হল। প্রজারা ফৌজদারি ছাড়া অন্য কোনো রকম মামলা নিয়ে আদালতে যাবে না। কেউ এই নিয়ম অমান্য করলে গ্রামবাসীরা তাকে একঘরে করবে, তার সঙ্গে কোনো সামাজিকতা রাখবে না।' (পৃঃ ২৪২, ঐ) বিরাট আরাম কেদারায় আসীন অমরেশ পুরী, স্থির দৃষ্টি, উপরোক্ত সংলাপ। যথার্থই জমিদারের (রবীন্দ্রনাথ) আত্মপ্রত্যয় পূর্ণ চরিত্রটা উঠে আসে! এই আরাম কেদারার মেজাজটাও বনেদী। রবীন্দ্রনাথের। বিদেশে গিয়ে অসুস্থ হয়ে বিরাট এক আরাম কেদারায় বসতেন। অভ্যাস। বুয়েনোস এয়ারেস থেকে ফেরার সময় সে কেদারা জাহাজে নেবার জন্য মনস্থির হল। কিন্তু জাহাজের কেবিনের দরজা দিয়ে সেটা ঢুকবে না। শেষে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর চেষ্টায় দরজা কেটে সে কেদারা জাহাজে ঢোকে। এরকম অসামান্য মেজাজী দৃশ্য, অমরেশ পুরী। [বসবার যোগ্য কিনা, উত্তরায়ণে রক্ষিত সে আরামকেদারা দ্রষ্টব্য, দুপুর দু'টোর মধ্যে, ছুটির দিন বাদ।]

আপ-টু-ডেট, অমরেশ পুরী অভিনীত ছবিগুলোতে অমরেশ পুরীকে যে সমস্ত পোষাক, ঘর বাড়ি ব্যবহার করতে দেখা গেছে—তার বাহুল্য অবর্ণনীয়। সাম্প্রতিক-কালে স্মরণীয় বৈভব, 'মিঃ ইণ্ডিয়া'। বিশাল রত্নখচিত জোব্বা গায়ে, আর পাঁচ আঙুলে রঙিন দুর্মূল্য আঙটি। বিশাল প্রাসাদ বাড়ি। সোনালী, লাল ভেলভেট সিঁড়ি। কখনো পাতালপুরী, কখনো চোরাকুঠুরিতে সিংহহাতল ওয়ালা আটফুট উঁচু সিংহাসন। মসমসে নাগড়াই হাঁটা—'ইন্‌ভিজিবলম্যান, মুঝকো ফর্মূলা দে দো'। এই সম্পূর্ণ বোম্বাই দৃশ্যটাকে শান্তিনিকেতনি ছাপায় কত অনায়াসে রবীন্দ্রনাথকে বসিয়ে দেওয়া যায়, তার নিদর্শন আছে নানা স্মৃতিকথায়। অমিতাভ চৌধুরীর 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' বইটা কিম্বা ঐ—'পিতৃস্মৃতি'তেই রথীন্দ্রনাথের লেখা এই পোশাক শৌখিনতা।'

'পোষাক পরিচ্ছদে বাবার বরাবরই বেশ রুচি ছিল। তরুণ বয়সে তিনি ধুতির উপরে সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবি

পরতেন। গলায় ঝোলাতেন সিল্কের চাদর। এই বাঙালী-বাবুর পোষাকে তাঁকে ভারি সুন্দর দেখাত। বাংলা দেশের বাইরে তিনি যখন বেড়াতে বেরোতেন, তাঁর পরনে থাকত ট্রাউজার, গলাবন্ধ লম্বা কোট অথবা আচকান, আর মাথায় থাকত ছোট্ট একটা পাগড়ি। এই ভাঁজে ভাঁজে শেলাই করা পাগড়ি ছিল নতুন জ্যাঠামশাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবিষ্কার। লোকে এর নাম দিয়েছিল 'পিরালি পাগড়ি'। এর অনেক বছর পরে বাবা আচকানের বদলে ঢিলেঢালা লম্বা জোব্বা ধরলেন। কখনো কখনো একটি জোব্বার উপর আর একটি জোব্বা চড়ানো হত। মাথায় পরতেন নরম মখমলের উঁচু গোছের টুপি। রঙিন কাপড়ে বাবার কোনো বিরাগ ছিল না—তাঁর পছন্দ ছিল ফিকে বাদামি বা কমলা রঙ।' (পৃঃ ২২৪)

ঘর বাড়ি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রুচির কথা উল্লেখ করলে সম্পূর্ণ সে দৃশ্যটার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে—

'আমাদের জোড়াসাঁকো-বাড়ির সবচেয়ে ভালো ভালো ঘর বাবার বসবাসের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। তাতেও যখন কুলোল না, তখন জোড়াসাঁকোর হাতার মধ্যে বাবার জন্যে আলাদা বাড়ি তৈরি করার খরচ মহর্ষি দিয়েছিলেন। লাল ইঁটের তৈরি বলে এ বাড়ির নাম হয় লালবাড়ি। বাবা কিন্তু এক বাড়িতে বেশিদিন থাকা একেবারে পছন্দ করতেন না, ঘন ঘন বাসা বদলাতেন। শান্তিনিকেতনে এমন দশ বিশটা বাড়ি আছে যেখানে কোনো না কোনো সময়ে বাবা থেকেছেন। সাবেক কালের বাড়ি ছেড়ে, নিজের পছন্দ মতো নূতন বাড়ি তৈরি করতে পারবেন ভেবে, মহর্ষির কাছ থেকে টাকা পেয়ে বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন।...বাবা প্রস্তাব করলেন, বাড়ি হবে দোতলা এবং দুইতলাতেই থাকবে একটি করে প্রকাণ্ড হল ঘর। (পৃঃ ২১৯-২০, ঐ)

মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন, 'উনি (রবীন্দ্রনাথ) নিজে খুব আংটি ভালবাসতেন। বহু বিচিত্র পাথরের আংটি পড়ার রুচি বোধ করতেন। দামি সমস্ত পোষাক, অলংকারে দেখতে যেন দেবতার মত লাগত।...হিরের এই আংটিটার কথা অবশ্য আমি কিছু জানি না, বলব না।'

সবচেয়ে বেশি যে দিকটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি এই সিনেমা প্রসঙ্গে, সেটা—শারীরিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও অমরেশ পুরীর সাদৃশ্যটা। চৈতন্যপেলবতা ছিল রবীন্দ্রনাথে—লাবণ্যময়। কিন্তু তিনি দীর্ঘদেহী। লম্বা, চওড়া কাঁধ, উন্নত মস্তক, দৃঢ় নাক, আজানুলম্বিত বাহু, সবার মাঝে দাঁড়িয়ে প্রধান হয়ে উঠার মত চেহারা ছিল তাঁর। সঙ্গে ব্যক্তিত্ব। যেখানে মূলত দৃঢ়তা, অস্পষ্ট দৃশ্যমান। লক্ষ্য করতে হয় অতসী কাঁচের মধ্যে দিয়ে। লাবণ্য নয়। এটা তাঁর অসম প্রসাধনের মত এসে জুটেছিল চেহারায়। আমাদের এদিকটা উপেক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ। তার বাইরে সবটাই কেমন অমরেশ পুরীর সঙ্গে মিলে যায় আমরা পাশাপাশি দুটো ষ্টিল নিলেই বুঝতে পারব। আজকে জগদীশ মালি কিম্বা রাকেশ শ্রেষ্ঠর হাতে রবীন্দ্রনাথের ষ্টিল ওঠালে কি এর ব্যতিক্রম হত কিছু? কিম্বা সে আমলে শম্ভু সাহার হাতে অমরেশ পুরীর ষ্টিল। যেন দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ—এটা কালচেতনার ব্যাপার; আলো, রঙ, পজিশন ইত্যাদি—সবেতে সময়ের ফ্লেভারটা লেগে যায়। 'পিতৃস্মৃতি'র ২৩২ পৃষ্ঠায় আছে 'তিনি অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে জন্মেছিলেন। ছেলেবেলায় আমার সেজো জ্যাঠামশায়ের তত্ত্বাবধানে যে শরীর চর্চার ব্যবস্থা ছিল, তাতে বাবার বিধিদত্ত স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। অন্যান্য ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে এক পেশাদার পালোয়ানের কাছে তিনি কুস্তিও শিখতেন। এই সব কারণে যুবা বয়সে বাবার স্বাস্থ্য ছিল দেখবার মতো।' আজও ঠিক এভাবেই বোম্বাইয়ের বাড়িতে সকাল-বিকাল শরীর চর্চা করেন অমরেশ পুরী। একই রকম চওড়া কাঁধ, লম্বা হাত-পা, উন্নত মাথা আর টিকালো নাক নিয়ে শম্ভু সাহা, রাকেশ শ্রেষ্ঠ এক হয়ে গেছেন।

● অমরেশ পুরীর সাক্ষ্যাৎকার, ঈষৎ পরিমার্জিত অবয়বে, স্বপক্ষে।

প্রশ্ন ॥ আপনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন?

উত্তর ॥ সেভাবে নয়। ভাবলাম পড়ে নিই। বম্বের বাসু

চ্যাটার্জী আমাকে সাহায্য করবেন বললেন। ভাল করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জানা থাকলে, তার উদ্দেশ্যে, তার ভাবধারা, কি রকম মানুষ ছিলেন—এসব বুঝতে পারলে চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে সুবিধা হয়। পুরোনো সভা সমাবেশে উপস্থিত রবীন্দ্রনাথের ছবির কাটিং, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি দেখলে, শুনলে আরো ভাল করে তুলে ধরা যাবে রবীন্দ্রনাথকে। একদম চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে অভিনয় করতে চাই আমি—অন্তত ভাল চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথও সেভাবেই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু শুনলাম, সেভাবে প্রয়োজন নেই। আমার চালচলন, তাকানো কথা বলা, কণ্ঠস্বর, আদব-কায়দা, হাসি, চেহারা—সব কিছুর মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠভাবে পরিচয় ঘটানো যায়। তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমাকে ঢুকে যেতে হবে না, রবীন্দ্রনাথকে আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। রবীন্দ্রনাথ কিভাবে হাঁটতেন বড় কথা নয়, রবীন্দ্রনাথের লেখা, কথাবার্তা থেকে যে মানুষটাকে আমরা পাই, তাতে হাঁটাটা হওয়া উচিত ছিল আমার মতই। হাসি, তাকানো, কায়দা-কানুন সবই আমার মত থাকা উচিত ছিল, ভাবতেই চমকিত হচ্ছি,—কী থ্রিল ভাবুন—রবীন্দ্রনাথই এখানে আমার সঙ্গে একাত্ম বোধ করতেন।

প্রশ্ন। চরিত্রটা পেয়ে আপনার কেমন লাগছে?

উত্তর। বেশ ভাল। এতদিনে দেখিয়ে দেব অভিনয় কাকে বলে। ঐসব মেয়েলি মার্কা কবিদের ধ্যান-ধারণা আমূল বদলে দেব। সবই তো চলে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই। রবীন্দ্রনাথের জন্যই শান্তিনিকেতনি কায়দায় এ দেশের সমস্ত কবিই মেয়ে হয়ে গিয়েছিল। এবার আমি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথই বদলে দেব—অ্যাংরি ইমেজ—আবার রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই এই দেশে কবি বলতেই একটা অ্যাংরি ইমেজ চলে আসবে।

প্রশ্ন॥ চরিত্রটায় অভিনয়ের কথা শুনে প্রথম কি মনে হয়েছিল?

উত্তর॥ ঠিক উল্টোটা। আমার ইমেজের বাইরের অভিনয়—মহান একজন মানুষ, মহৎ কবি আর দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ—ধীর, স্থির, সৌম্য আর শুচিতার মূর্তিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেটা ভেবেছিলাম আমার পক্ষে একটা নতুন সুযোগ, একটা স্কোপ—ইমেজ ভেঙে বেরনোর। আর এখন বুঝছি, আসলে স্কোপটা আমার নয়, রবীন্দ্রনাথের, অনেকদিনের ইমেজ ভেঙে বেরনোর স্কোপ পেলেন উনি।

প্রশ্ন॥ ছবিটার ব্যাপারে আপনি উৎসাহী হলেন কেন?

উত্তর॥ প্রথমত, এটা পরীক্ষামূলক ভাবে তৈরী হতে যাওয়া আন্তর্জাতিক আবেদনের ছবি আর দ্বিতীয়ত, বিগ্ বাজেট এবং তৃতীয়ত, আমার জীবনের প্রথম এ ধরনের নায়কের চরিত্রে অভিনয়।

প্রশ্ন॥ দীর্ঘদেহী মানুষ আপনি, রবীন্দ্রনাথ ও আপনার মতই দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান ছিলেন। এখনকার আপনাকে দেখে জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে—রবীন্দ্রনাথের যেমন 'জীবনস্মৃতি' থেকে তাঁর ছেলেবেলার খোঁজ পাই, তেমনি আপনিও কখনো ছোট ছিলেন কিনা?

উত্তর॥ মোক্ষম প্রশ্ন। আর এই উত্তরটা ছবি যাঁরা বানাচ্ছেন, তাঁরাও ভেবেছেন। তাঁরা ভেবে কিনারা করতে পারেন নি যে আমিও ছোট ছিলাম। তাই তাঁরাও সিনেমাটা থেকে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাটা বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। আমি যেমন, কি ধরণের ছোট ছিলাম, এ প্রশ্নটা ওঠা স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এটা তেমনি উঠছে…

প্রশ্ন॥ রবীন্দ্রনাথের কোন্ ব্যাপারগুলোয় আপনি বেশি রিঅ্যাক্ট করেছেন?

উত্তর॥ আমার অ্যাঙ্গেল থেকে বললে, অবাক লাগে এটাই—অত বড় বাড়ির ছেলে, অত নারী জীবনে

এল-গেল, অতগুলো টাকা হাতে পেলেন। সারা পৃথিবীতে স্টারদের মত ঘুরে বেড়ালেন, ঐকালে শান্তিনিকেতনে মেয়ে নাচালেন — তারপরও কিভাবে অত সৃষ্টিধর্মী কাজ করে যেতে পারলেন, সেটাই বিস্ময়! এটা কেউ পারে না। এখানেই জিনিয়াস, লাইফের ব্যালেন্সটা ঠিক রাখলেন— কত জিনিয়াসকে আমি ভেসে যেতে দেখলাম এসবে—রবীন্দ্রনাথের এটা আমাকে খুব অবাক করে।

প্রশ্ন ॥ রবীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টির সঙ্গে নিজেই গান গেয়েছিলেন, নেচে ছিলেন, অভিনয় করেছিলেন···

উত্তর ॥ আমিও গাইব, নাচব। গান তো রবীন্দ্রনাথেরই সব। তবে প্লেব্যাকটা আমার মতে আমাকে দিয়েই করানো উচিত।

প্রশ্ন ॥ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারবেন ?!

উত্তর ॥ কেন নয়? সেটা কি মানুষেরা গায় না?

প্রশ্ন ॥ না, আপনার গলার মধ্যে তো কোমলতার ব্যাপারটা অতটা—

উত্তর ॥ ঐ জন্যই তো গাইতে চাইছি। নাচ, গান আর ঐ রকম থাকবে না। এটা হবে আরো লাইফ ফুল আর অবশ্যই অ্যাংরি, লাইক, অমিতাভ বচ্চন, মেরে অঙ্গনেমে তুমহারা ক্যায়া কাম হ্যায়··· ইয়ে ক্যায়া গান নেহি তো ঝগড়া হ্যায়?

প্রশ্ন ॥ শুনছি, আপনাদের অনেকটা বিদেশে স্যুটিং আছে--সে সব নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন নাকি আপনারা···

উত্তর ॥ ঠিকই শুনেছেন। আসলে গণ্ডগোলটা রবীন্দ্রনাথই করে গেছেন। রাশিয়া আমেরিকা, এই দুটো লবি—দুটো জায়গাতেই উনি বেড়িয়ে এসেছেন। এখন দু' জায়গাতেই স্যুটিং করা করা দরকার এসব দৃশ্যের। কিন্তু আমাদের বেছে নিতে হবে একটা। যখন যে সরকার, তখন সে লবি। কংগ্রেস হলে রাশিয়া। রাজীবজীর মৃত্যুর সঙ্গে সি. আই. এ-র নামটা জড়িয়ে গিয়ে এখন আরো বাজে অবস্থা আমেরিকান লবির। আর ভি. পি. সিংজী, চন্দ্রশেখরজী ঐসব বিরোধীরা থাকলে আমেরিকা। চন্দ্রজী বহুৎ আমেরিকান চক্কর নিয়ে চলে—ওনারা তো সরকারই রাখতে পারলেন না সে কারণে। এক সঙ্গে পাঁচটা নেতা যদি আমেরিকান লবি চালায়—আমেরিকা তো ফেলবেই—সেটাই হল। যাক, এসব ছোড় দিজীয়ে। এগুলো কিন্তু লিখবেন না। প্লিজ, আমি ফিল্মের লোক—রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে চাই না। তা বুঝলেন তো, দুটো সফর ছবিতে রাখা যাবে না, সেই সমস্যাটা কোথায়?

প্রশ্ন ॥ হুঁ। আপনার কী মনে হয়—রবীন্দ্রনাথ সিনেমাটার সমস্ত পরিকল্পনাটা কিভাবে নিতেন?

উত্তর ॥ ফাইন। হোয়াই নট্ ?! তিনিও প্রথা ভেঙেছেন।

প্রশ্ন ॥ প্রথমদিন কোন্ দৃশ্যটার আপনি অভিনয় করতে চান?

উত্তর ॥ নোবল প্রাইজ। টাকাটা আসার পর বাগানে পায়চারি করছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রায় বিকেল। অল্প নরম আলোয় টাকা নিয়ে, অসংখ্য টাকার মধ্যে তিনি দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। চারদিক থেকে টাকা পড়ছে, টাকা নিয়ে খেলছেন তিনি···

প্রশ্ন ॥ এতো সত্যজিৎ-এর 'নায়ক'—

উত্তর ॥ তারও আগে আছে কুরিশা ওমু-র ছবিতে এই দৃশ্যটা। অত টাকা নিয়ে কি করবেন রবীন্দ্রনাথ জানেন না। রথী এসে বলল, বাবা ব্যাঙ্ক ফেল পড়ছে—সেখানে টাকাটা রেখে দাও, সুদে বাড়বে—তাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসাটাও বাড়বে, শান্তিনিকেতনের আশ্রম ব্যবসাটাও বাড়বে—রবীন্দ্রনাথ বিভ্রান্ত—শুধু টাকার মধ্যে। চিত্রনাট্যে—কাট্। নেকস্ট্ শট—ক্লোজ আপ, উইথ এক্সট্রা এফেক্টিভ লেন্স—সংলাপ, 'মুগাম্বো খুশ হুয়া!'

□ ছবির আকর্ষণ : রবীন্দ্রনাথকে দশটি প্রশ্ন

রতনকিশোর' বলেছিল, এতদিন ধরে উঠে আসা বহু প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবে সে ছবিতে। থাকবে অমরেশ পুরীর মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। যে সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে ধোঁয়াশা আছে, যে সমস্ত প্রশ্ন কেউ করতে পারেনি এতদিন—যে সব প্রশ্নের উত্তর জানলে রবীন্দ্র চর্চার দিগন্ত খুলে যাবে, তেমনি বহু রহস্যময় আর অজানা প্রশ্নের উত্তর থাকবে। তারই নির্বাচিত দশটা প্রশ্ন সাজিয়ে রাখা হল। উত্তর পাবার জন্য সময়মত নিকটবর্তী ছবিঘরে আসুন। এটাই রতন-কিশোরের শেষ নিবেদন—

এক ॥ শান্তিনিকেতনের আয়তন বৃদ্ধি করতে বেশ কিছু জমি অন্যায় ভাবে দখল করেছিলেন বলে শোনা যায়, এ বিষয়ে একাধিক মামলার খবর ও ছিল—সে সব দাবী উঠল কেন ?

দুই ॥ 'পথের দাবী' নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতিবাদে স্বাক্ষর করলেন না কেন ? বরং ইংরেজের পক্ষে শরৎচন্দ্র বিরোধী কিছু কথা বললেন।

তিন ॥ গান্ধীজীর ঐ পোষাককে আপনি ব্যঙ্গ করেছিলেন, গায়ে অত পোষাক, সে বিরোধিতার কারণেও কিছুটা। গান্ধী নাঙা সন্ন্যাসী, আর আপনাকে লোকে যীশুখৃষ্ট বলত—এটাও কি গান্ধীর মত দেবতা সাজার একটা স্টাণ্ট নয় ?

চার ॥ আপনার প্রায় সমস্ত প্রধান লেখাই প্রমাণিত হচ্ছে বিদেশী সাহিত্য থেকে টুকলি। এটা কতটা সত্য ?

পাঁচ ॥ আপনার একেবারে প্রথমদিকের লেখা ৬ খানা বই —ভগ্নহৃদয়, শৈশব সঙ্গীত, প্রকৃতির প্রতিশোধ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ছবি ও গান, মানসী—কাউকে স্পষ্ট উৎসর্গ করা নয়, কিন্তু হেঁয়ালীতে তা কাদম্বরী দেবী—সেটা কি সত্যই কাদম্বরী দেবী ? তবে নাম উল্লেখে এত সংকোচ কেন, তিনি তো জানি সম্পর্কে বৌদি—

ছয় ॥ মা-কে একটাও বই উৎসর্গ করেননি কেন ?

সাত ॥ এটা ব্যক্তিগত হলেও প্রাসঙ্গিক আজ, মৃণালিনী দেবী আপনার স্ত্রী। খুবই সাধারণ পরিবারের মেয়ে ছিলেন। মানসিকভাবে আপনার মত পরিণত নন, তবু পাঁচ সন্তানের মা হয়েও তিনি আপনার পাশে আসার যথার্থ যোগ্যতা লাভ করলেন না—ভালবাসার অবহেলায় অকালে মরতে হল--এ বিষয়ে কি কোনো প্রশ্ন তোলা যায় ?

আট ॥ রবি অনুরাগিনীদের ভূমিকা কী আপনার জীবনে ? মৃণালিনী দেবীকে অবহেলার পিছনে এসবের গুরুত্ব কতখানি ?

নয় ॥ 'বিভাব' পত্রিকায় কয়েক বছর আগে নিত্যপ্রিয় ঘোষই তো মনে হয়—খুব ইয়ে করে বলেছিলেন যে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ায় আপনার নাকি নিজস্ব হাত ছিল—

দশ ॥ রামজেঠমালানি ওনার জীবনের শুরুতেই প্রশ্নটা করেছিলেন, আজও উত্তর দেন নি আপনি। সেই একশোটা প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নটাই আবার করছি—নিন্দুকেরা বলে, নাকি এটাই সত্যি যে, আপনি আলখাল্লার তলায় আণ্ডার অয়ার পরেন না ?

অথ সংস্কৃতি কথা

● সুপ্রতিম সরকার
প্রথম বর্ষ, অর্থনীতি বিভাগ

মেয়েটির কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম বললে কম বলা হবে। অবাক নয়, রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেটা নব্বই সালের শেষ দিক, সম্ভবত নভেম্বর মাস। প্রেসি-ডেন্সিতে সবে ঢুকেছি। কলেজে কিছুদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে একটি কবি সম্মেলন, আসবেন বিখ্যাত কবিরা। সেই অনুষ্ঠানের জন্য জমজমাট ক্যান্টিনে চাঁদা তুলছি। কেউ সানন্দে দিচ্ছে, এড়িয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ। ক্যান্টীন থেকে বেরোবার মুখেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা। নাম জানতাম না, মুখ চিনতাম। বললাম, "আমরা একটা কবিতার প্রোগ্রাম করছি কলেজে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষদের আসার কথা আছে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে··· ।" আসল কথায় আসার আগেই মেয়েটি আমাকে থামিয়ে দিল। সরলভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, সুভাষ, শক্তি, শঙ্খ এরা কোন ইয়ারে পড়ে ? কোন ডিপার্টমেন্ট ?"

এরপর আর ইতিহাস বিভাগের ছাত্রীটির থেকে চাঁদা চাওয়ার সাহস হয়নি। ভর্তি হওয়ার আগে প্রেসিডেন্সি সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল। কিছুটা পত্রপত্রিকায় পড়ে আর বাকিটা পরিচিতদের মুখে শুনে। যতটা না কৌতূহল তার চেয়েও বেশি ছিল ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা। এই ঘটনায় কলেজ সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটেছিল এমন নয়, তবে প্রেসিডেন্সি মানেই একটা আলাদা ব্যাপার, এই ধারণাটা ধাক্কা খেয়েছিল।

বাঙালী হলেই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সব খুঁটিনাটি খবর রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই। নিজের ভাল লাগার একটা প্রশ্ন থাকবেই। তবু একটা ন্যূনতম সাংস্কৃতিক ধারণাও না থাকাটা বোধহয় ভাল না লাগার যুক্তি দিয়ে আড়াল করা যায় না। ক্ষেত্রবিশেষে অর্দ্ধেক জানার চেয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাও ভাল কিন্তু উল্টোটাও কখনও কখনও সত্যি।

প্রেসিডেন্সির সংস্কৃতিচর্চা ব্যাপারটাই বেশ গোলমেলে। সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি বলতে যে এখানে ঠিক কি বোঝান হয় বলা মুশকিল। নানা মুনির নানা মত। পাঁচজনের কাছে যেটা সুস্থ সংস্কৃতি, আর পাঁচজনের চোখে সেটাই বিকৃত। কারুর কাছে সংস্কৃতি রাজনীতির হাতিয়ার, কারুর কাছে শুধুই হাল্কা বিনোদন।

সংস্কৃতির এই কাফটেলে তথাকথিত প্রতিষ্ঠান-বিরোধীরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও আছেন স্বমহিমায়। এদের কাছ থেকে দেখলে বা কথা বললে শরচ্চন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-এর মেজদার কথা মনে পড়বেই। কলেজটা মোটামুটি অর্বাচীনে ভরা তাই এদের প্রকৃত মর্ম কেউ বুঝতে পারছে না—এটাই এদের প্রধান ক্ষোভ বা আক্ষেপ। অথচ মজার কথা, অসতর্ক মুহূর্ত ছাড়া এই ক্ষোভ কদাচিৎ প্রকাশ পায়। একটা কৃত্রিম, কিছুতেই-কিছু এসে যায় না ভাব দেখিয়েই সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম তো সব সময় নিয়মকে প্রমাণিত করে না। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায়, প্রথা বিরোধিতায় অন্যায় কিছু নেই। তবে প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য লাভে ব্যর্থতাই যখন হয় 'অফ-বিট' হওয়ার একমাত্র কারণ তখনই ঘটে বিপত্তি। চার দিকে যা ঘটছে, তার সমালোচনা এবং আরও সমালোচনাই তখন টিকে থাকার অবলম্বন হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। এর নামই বোধ হয় 'সিউডো-ইন্‌টেলেক-চুয়ালিজম'।

পাশ্চাত্য বিরোধিতা। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের একটা অংশের মধ্যে এই প্রবণতা চোখে পড়ছে ইদানীং। যা কিছু পশ্চিমের সব খারাপ, এটা যেনতেনপ্রকারেণ প্রমাণ করাই যেন এদের সংস্কৃতি। কলেজে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুষ্ঠান—অপসংস্কৃতি! ফেষ্টিভ্যালে শ্রুতিনাটকের থেকে যদি 'স্কিট' দেখতে বেশি ভিড় হয়, অপসংস্কৃতি। এদের

হাতেই যেন সংস্কৃতির ঠিকাদারী, তার সুস্থতা রক্ষার দায়িত্ব। কখনও ' কখনও বিনোদন শালীনতার মাত্রা ছাড়ায় ঠিকই কিন্তু অপসংস্কৃতি, অসুস্থ সংস্কৃতি বলে চিৎকার করা আর ডজনখানেক লিফলেট বিলি করাটা তো সমাধান নয়। কোনটা খারাপ, কোনটা অবক্ষয়ী এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোটা কঠিন নয়, কঠিন হল যেটা ভাল, যেটা সুস্থ সেটা করে দেখিয়ে তার পক্ষে ছাত্র ছাত্রীদের সংঘবদ্ধ করা। বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার এই কঠিন কাজটি করার সময় কেন সংস্কৃতি প্রেমীক দের খুঁজে পাওয়া যায় না? অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধে ছাত্রদের শামিল করার উদ্যোগ নেওয়ার সৎসাহস না থাকলে সুস্থ সংস্কৃতির ওকালতি না করাই ভাল।

পছন্দটা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। মুশকিল হল, সংস্কৃতিকেও অনেকে গুলিয়ে ফেলে নিজস্ব রুচির সঙ্গে। অবক্ষয়ী সংস্কৃতির কথা যখন উঠলই সেই প্রসঙ্গেই এটা বলা দরকার। অনেকের যুক্তি এরকম: জোর করে কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যেটা করতে, দেখতে বা পড়তে ভাল লাগে সেটাই করা উচিত। খুব ভাল কথা। গ্রাহাম গ্রীনের চেয়ে 'মিলস অ্যাণ্ড বুন' আমার কাছে বেশি প্রিয় হলে কারুর কিছু বলার নেই। সত্যজিৎ রায়ের থেকে অঞ্জন চৌধুরীর ছবি দেখতে যদি আমার বেশি ভাল লাগে সেটাও আমার ব্যাপার। কিন্তু আমি কখনই দাবি করতে পারি না যে অমুকের থেকে অমুকটা আমাকে আকর্ষণ করে, তাই অমুকটাই আমার কাছে সুস্থসংস্কৃতি। জনপ্রিয়তাই যেহেতু শৈল্পিক গুণের মানদণ্ড নয়, আমার অবশ্যই মেনে নেওয়া উচিত যে সস্তা চটকদার জিনিসই আমার রুচির সাথে খাপ্ খায়: এটা মেনে না নিয়ে সাধারণী করণের অভিযোগ তুলে কোনটা সস্তা আর কোনটা নয় এই তর্কে যারা শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চায় তাদের ব্যাপারে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

কলেজে সংস্কৃতি নিয়ে এই প্রহসনের সবচেয়ে খারাপ দিক বোধ হয় এই যে ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বিরাট অংশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। বিরক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কলেজে ভাল কিছু হলেও এই অংশটি নির্লিপ্ত থাকতেই পছন্দ করে। তাই বার্গম্যানের ছবি দেখানো হলেও ডিরোজিও হল প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে, নাটক নিয়ে সেমিনার হলে তাতে শ্রোতার চেয়ে বক্তার সংখ্যা বেশি থাকে। অভাব সচেতনতার নয়, অভাব উৎসাহের। আর এই নিরুৎসাহের দায় অনেকটাই কলেজের বিভিন্ন মতাবলম্বী দলের যাদের সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির লড়াইটা যতটা না সাংস্কৃতিক তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। ব্যাপারটা এত দৃষ্টিকটু যে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ জানাতে গেলে কেউকেউ জানাতে চান কোন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় এসব হচ্ছে, ইউনিয়ন সমর্থন করছে কি না ইত্যাদি। অবশ্য ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যেই যেখানে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব সেখানে এমন তো হবেই।

গত বছর কলেজ ফেষ্টিভ্যাল 'মিলিউ'তে ইংরাজী বিতর্কের বিষয় ছিল—"ইন্‌টেলেকচুয়ালিজম ইন প্রেসিডেন্সি ইজ আ মিথ্"। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপকরা যে মতের পক্ষে বলেছিল সেটা খুব বড় কথা নয়, ঐ বিতর্কের মধ্যস্থতায় কলেজের সাংস্কৃতিক দৈন্যের যে চেহারা প্রকট হয়ে পড়েছিল সেটাই চিন্তার। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের বিষয় নিয়ে বিতর্কের আয়োজন করতে না হয় সে ব্যাপারে কিছু করার সময় কি এখনও আসেনি? যেমন চলছে, তেমনই চলুক না, এই মনোভাবটা পাল্টানো দরকার। এখনই। কাজটা কঠিন, তবে অসম্ভব কখনই নয়।

সর্বনাশাকালীন অতীত কাতরতা

● রাজর্ষি দাশগুপ্ত

অন্যান্য কণ্ঠস্বরের মধ্যেও একটা মোটা দরাজ গলা (প্রায় অশিক্ষিত উচ্চারণ) ছাপিয়ে উঠছিল। একটি ছেলে, না মোটাসোটা অথচ মোটার দিকে কিম্বা রোগার দিকে, তেকোনা হয়ে বসে পা দুটোকে টেবিলের তলায় ঠেলে গান গাইছিল। গাইতে গাইতে যতটা পারে ভুরু তুলে আঙুল নেড়ে, নায়ক সেজে গুজে বসার চেষ্টায় আছে ছোকরা, ভাবলাম। আচ্ছা আলাপ করে ফেলাই যাক ভেবে তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। চায়ের কাপে আঙুল ঠুকে ঠুকে নামটা জানাল সে। ছাত্র, তাও ইস্কুলের শেষ ধাপের একজন। ওহ, ভাবলাম, এই হল আরেকজন বিপ্লব আর বিপর্য্যস্ত ব্যবস্থায় বিরক্ত। সে তাকাল। দেখলাম হাসলে তার আলজিভ অবধি দেখা যায়, সেই ইস্তক ভালো লেগে গেল ছোকরাকে। দোকান থেকে উঠে যেতে যেতে ঠিক করে ফেলা গেল দেখা হচ্ছে আগামী রবিবার।

রবিবারের আগেই বৃহস্পতিবার এক বান্ধবীর সাথে দেখা হয়ে গেল যখন আমি দুপুর বেলাটা কাউকে পাকড়ে আড্ডার ধান্দায় আছি। ভদ্রমহিলা আবার সংস্কৃতি পরায়ণা। মনে হোল বেশ গোলমেলে ব্যাপার। সিনেমার কিউতে বোনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে। যেন তেমন কাউকে দেখতে পেলেই প্রেম পাবে। অবশ্য এখন প্রচুর বুদ্ধিমতী চতুর মেয়েরা বোকা ছেলেদের সঙ্গে হিন্দী সিনেমা দেখে। সেখান থেকে সোজা কেটে পড়ে গেলাম এক পরিচিত আড্ডায়। বিতর্ক চলছে এবং তারাই সিগারেট পাবে যারা বিতর্কে প্রতিযোগী। বিষয় হল কি এক মার্কসীয় তত্ত্ব বনাম এক সোকল্ড বুদ্ধিজীবির বক্তব্য। কি বললাম মনে নেই তবে বেশ কয়েকটা সিগারেট পাওয়া গেল। রাত্রে আমার পদ্য লেখা প্রয়োজন কারণ ভয়ঙ্কর কিছু লেখালেখি করে বাংলা সাহিত্যের সর্বনাশ না করে আমার স্বস্তি হচ্ছিল না। তাই ব্যর্থ প্রেম বা বিপ্লবী কবিতা শীর্ষে আজেবাজে শব্দ করে অনেক দুঃখের কথা ভেবে টেবে কিছু একটা খাড়া করলাম।

এখন ঘটনা ছিল এই যে কলকাতায় থাকলে প্রাক্তন প্রেমিকা এবং বর্তমান প্রেমিকেরা—'আমরা কি সুখী' গোছের উদ্ভাসিত মুখ নিয়ে ঘুরছিলেন। সুতরাং এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম শান্তিনিকেতন থেকে জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং। সেখানে বেশ ঠাণ্ডা তবে বিস্তর বোকা বাঙালী যারা শুধু খায় আর কেনে।

রবিবার সেই ছোকরাকে পাকড়াও করে বিশদ গপ্পো বিস্তারিত বলার পরে সে বোঝাল যে পুরোটাই নাকি সমস্যা তাও আবার শিল্পের। অর্থাৎ আমি (তার মতে) ভালোবেসেছি কারণ তা নইলে পদ্যের বিষয় মেলে না। অনেকক্ষণ চশমা খুলে নাক কুঁচকে ভাবার চেষ্টায় রইলাম ছোকরা অপমানজনক কিছু বলতে চায় কি না। সে ততোক্ষণে হাতটাত নেড়ে দিব্যি এক গপ্পো ফেঁদে বসেছে যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল মানুষের জীবনযাপন কেবল বিষ্ঠাত্যাগের স্বার্থকতায় আর শিল্পীর জীবনযাপন শিল্প সৃষ্টির স্বার্থে যা কি না মহৎ। তাই শিল্পী এবং মানুষ সমগোত্রীয় হতে পারে কিন্তু অসবর্ণ আসলে। মনে মনে আমি তো তখন ভাবায় ভীষণ চেষ্টা আছি যে আমি যা করেছি সবই কি শিল্পের স্বার্থে। শুনতে পেলাম সে বলছে যে যা করা হয় তা স্রেফ শিল্পের পটভূমি আর এই কৃত্যজাত অনুভূতি শিল্পের মাতা। পিতা নয় কেন জিজ্ঞাসা করাতে সে আমাকে দাবড়ে দিল—যে স্মৃতি, ব্যক্তিত্ব, রাজনীতি এরা সবাই পিতার সংজ্ঞাধীন এবং সার্থক শিল্প সব সময়ই জারজ। এর মধ্যে আমি রাজনীতি, নিজস্ব ফ্ল্যাশব্যাক্ ইত্যাদিতে অভিনিবিষ্ট হয়ে পড়লাম কারণ আমার পদ্যকে আমি সার্থক মনে করি।

সে আবারো বললে যে বাংলাদেশে ইদানীংকালে শিল্পে যা হচ্ছে তা সফল কিন্তু সার্থক নয় কারণ মনন

বিষয়টা শেষ বুঝেছেন ঋত্বিক আর তারপর তো সবাই নান্দনিকতার 'মুখ্য' সচেতক' (প্রত্যেকেই, বলে সে একটু খেউড় করল)। তিনবার চা হয়ে গেল এবং তিন দুগুনে ছটি বিস্কুট। তখনও ছোকরা শিল্প, রাজনীতি ও তাবৎ জীবন নিয়ে বকে চলেছে। শেষ অবধি যা বোঝা গেল তা হল এই যে যত ছড়িয়ে ছিটিয়ে জীবনকে দেখে নেয়া যায় এবং একটু আধটু ভাষা ও প্রকরণগত ব্যাকরণ মেনে যত মানুষকে আন্তরিকভাবে সে গল্পো শোনানো যায়, তত শিল্প সার্থক হয়। উদাহরণ স্বরূপ ওর বক্তব্য।

অনেক সন্ধ্যার খতিয়ান করতে করতে হাঁটতে লাগলাম গড়িয়াহাটের দিকে। ইসবগুলের বিজ্ঞাপনের মানুষটার জন্য আমার ভীষণ মন কেমন করতে থাকে। কেমন গালে হাত দিয়ে বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকা, যেন কেউ চলে গেছে এবং গেছে চিরতরে। ভাবাই যায় না যে ও-সবের বিজ্ঞাপন। অনিশ্চিতভাবে বাস ধরে বাড়ি ফিরব না ঢাকুরিয়া নেমে আড্ডা দেব ভাবতে ভাবতে ব্রিজ থেকে নেমে পড়ে দেখলাম একটি ছেলে (সঙ্গে একটি মেয়ে) এক বৃদ্ধা ভিখারিনীকে অনেক পয়সা দিল। প্রেম সততই মহৎ। একা থাকলে ছেলেটি পয়সা টয়সা তো দিতোই না আবার বিয়ে হয়ে গেলেও দেবে না। এই মাঝখানের সময়টা কি সুন্দর। হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে পড়ল সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুর বিকেল সোয়া পাঁচটার সূর্য্য। মনটা ভালো হয়ে গেল কারণ অত লোকজন নড়ছে সম্বলিত ডুবন্ত সূর্য কোনো ছবিতে আঁকা তো যাবেই না, ম্যুভিতে আবার অনুভূতিটাই না থাকতে পারে। হাওয়ার মুখে হতভম্ব কোর্তার বোতাম লাগাচ্ছি এমন সময় শুনলাম কিছু লোক চেঁচাচ্ছে। তার মধ্যে শোনা যাচ্ছে কে যেন কাউকে মেরে ফেলেছে। এক বন্ধু এসে খানিকক্ষণ ঘোলাটে ঘষা কাঁচের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে দুঃখ পায়নি ভান করতে লাগল। আর একজন ক্রমাগত বিয়েবাড়ির ব্যস্ত বিমূঢ় (যে যুবকরা কর্মদক্ষতায় যুবতীদের হতবাক করে দেয়) ছোকরাদের মতো এদিক ওদিক করছিল। শেষে বুড়ো এসে বলল ঘড়ঘড়ে গলায় জানলা খোলা ছিল। ওরা খুন করেছে। তখনই ঢুকে পড়ল সেই ছোকরা। খানিকক্ষণ পর বাঁ হাত দিয়ে কপালের চুলটা তুলে বসে পড়ল। বোঝা গেল ছোকরা সত্যিই দুঃখিত কারণ ও সেটা চাপার চেষ্টা করছিল।

এরপর ওর সাথে দুবার দেখা হয়েছিল। একবার সেই চায়ের দোকানের পেছনে একটা পুরোনো সান বাঁধানো জায়গায় লিলিপুল করবে বলে ধীরে সুস্থে পদ্ম এবং অন্যান্য উদ্ভিদ নিয়ে সবাইকে প্রশ্ন করে জানতে চাইছিল। দ্বিতীয় বার, সেটা একটা বসন্তে, প্রথম ওর বাড়ি গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ হতো আর উঠে ডান দিকে পাল্লা ঠেললেই ওর খানিকটা পরিপাটী আর অগোছালো ঘর। ওর মা কাঁদছিলেন আর গোটা জগত ও জাগতিক শিল্প সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর কিছু একটা ভাবতে গিয়ে মারা গেছিল। ওর ঘরে ছিল হলুদ আলো আর কি আশ্চর্য ওর আঁকা ছবির মানুষগুলোর হাত কি লম্বা। এর অনেকদিন পর আবার গ্রীষ্মের একটা চমৎকার লম্বা দিনে আমরা সেখানে আড্ডা মারতে যেতে শুরু করলাম।

সে নময়টা আমরা নাটক নিয়ে বসে। আমাদের এক বন্ধু নাটক লিখেছিল। তাতে নায়ক নেই, নায়িকা নেই, ব্যাকড্রপে একটা খোক্কস ধরণের জীব আঁকা থাকবে (মঞ্চ সজ্জা) এবং সারা নাটকে সব ঠোক্কর খাওয়া সংলাপ। একদিন মহলায় রবি সংলাপ ভুলে গেল আর বানিয়ে বানিয়ে চমৎকার সব স্বাভাবিক কথা বসিয়ে বলতে থাকল। নির্দেশক কিছু বলার আগেই আমরা এসে খুব প্রশংসা করলাম এবং রবি জানালো নাটকটার উত্তরানোর পক্ষে ওটাই একমাত্র সম্ভাব্য পথ। কিভাবে যেন কথাটা কেউ নাট্যকারের লম্বা কানে তুলে দেয়, তার প্রেমিকার দিদি এসে (সঙ্গে সেই মহিলার ননদ যিনি একদা কার একটা ওয়ার্কশপে ছিলেন) আমাদের নাটকের শৃঙ্খলা নিয়ে অনেক কিছু বললেন। আমাদের মধ্যে দু চারটি মন্তব্য হল

চাপা গলায়। পরদিন আমরা দল ছেড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

এভাবে কিন্তু আমরা মন্দ ছিলাম না, কিছু ভণ্ডুল করে তাবড় শিল্পকে সৎকার করে একটা সুখ পেতাম। এর মধ্যে এক বন্ধু আবার রুশচীন বিতর্কের নোনতা অমলেট, পাটি ভাগ ও অনন্ত রায়কে নিয়ে পাগলামি শুরু করল। দেখা গেল পোটেমকিনে নাবিকরা যতটা উদ্দীপনা নিয়ে ধর্মঘটে যাচ্ছিল, ততটাই ভালোবাসা নিয়ে বেদভিত্তিক সাম্য প্রচার করতে লাগল কলকাতাবাসীরা, সে গঙ্গার পার ধরে হাঁটত বরাবর আর প্রতিষ্ঠানের স্নায়ুরোগ হিসাবে আমলাতন্ত্র কতটা ভাঙতে পারে সচেতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে এই নিয়ে ভাবত। এর মধ্যে পরীক্ষা এসে পড়ল। এবং স্বপ্নের নাম গণভোটে পাল্টে হল পেত্রোগ্রাদ।

সন্দেহাকুল হতাম আমরা পাঠ্যসূচী দেখে কারণ ও সবই বুর্জোয়া এবং সেজন্য (সেটা ওজর করে) পড়াশুনো করতাম কম। কিছু না জেনে, মায় কবির নামও,রবি ভয় পেয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করাতে বলল, কবি যা বলেছেন তার থেকে ওর উত্তরে জীবনদর্শন অনেক বেশী। তাই এখন থেকে কবিতাটির বদলে ওর উত্তরটাই পাঠ্য করা উচিত। এরপর আমরা ছিটকে যেতে শুরু করলাম দূরে। অনেকদিন বাদে দেখা হলে বুড়ো সারাক্ষণ ক্রুশ্চেভকে দায়ী করত,রবি বলত ওটা নাকি সরলীকরণ, মোট কথা রেডিওতে ইণ্টারন্যাশনাল শোনা যেত না। গগন একটা বিকট ছবি আঁকলো। তিনটে পাগল তিন রঙের ঘরে বসে আছে। একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম। হাঁটু গেড়ে বসে আছি আর পা দুটো উদ্ভিদ হয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই ক্রমে ক্রমে। দূরের বারান্দায় দাউ দাউ আগুন আর বুড়ো কুৎসিত ভাবে বলছে, নীলডাউন হয়ে থাক, সেরে যাবে। ঘুম থেকে উঠে একটা ছবি আঁকতে গিয়ে অনেক কাগজ নষ্ট করে গেলাম গান শুনতে।

ভীষণ দুঃখ দুঃখ মুখ করে কে যেন আগুনের পরশমণি গাইছিলো, বাকীরা কি অভিব্যক্তি হওয়া উচিত ঠিক করতে না পারায় একটা গ্রুপ ফটো মার্কা হাসি হাসি গাম্ভীর্য্য নিয়ে বসে আছে। সারাটা দুপুর বদমাইশি ভরা চোখওয়ালা শুভর সাথে আড্ডা মেরে অম্লান ধূর্ততার সাথে কিছু টাকা নিলাম। ওর কাছ থেকে।

অতঃপর পার্কে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়ালাম, তারপর দুটো বাচ্চাকে বলে কিভাবে স্যুইং করাতে হয় শেখালাম। মালী এসে ঘাস ছাঁটতে শুরু করল। মাঠে শুয়ে পড়ে পিঠে, কানের পাশে একটা সবুজ এলোকেশী দেয়াল, সামনে নীল বারান্দা আর পায়ের তলায় সঞ্চারী বাস, ট্রাম, ট্যাক্সির আওয়াজ পেতে পেতে একটা পদ্য হয়ে যেতে শুরু করলাম। ফেরার পথে হাতের তালুটা ঠোঁটে রাখলাম মনে হলো একটা হাত নেমে গিয়ে শরীরে সবুজ সূর্য ছিটিয়ে ছিচ্ছে। চোখে মুখে একটা হলদে আলো, সেই ছোকরার বাড়ির মতো। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে শুনলাম কে একটা হোণ্ডা বাইকের মতো আওয়াজ করে গোঙাচ্ছে—ওকে খুন করা হল, সেই ভোঁতা গলার বেখাপ্পা আর্তনাদ ছাড়া সারারাত আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না। ভোরে জ্বর এলো।

কথোপকথন

● যশোধরা রায় চৌধুরী

ঋদ্ধির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল সম্যক্তা। সম্যক্তার বাড়ীতে টেলিফোন নেই। ঋদ্ধির বাড়ীর টেলিফোনটা অকেজো। ওষুধের দোকান থেকে ঋদ্ধির পাশের বাড়ীতে ফোন করেছিল সাড়ে আটটায়, অফিসের জন্য তৈরী হয়ে বেরিয়ে। নন্দ হাই তুলে তাকিয়ে ছিল টেলিফোনের দিকে। ধূলো পড়ে আছে। দুটাকা করে দিতে হবে চার্জটা। বিলটা দিয়ে আসতে হবে কালই। পারেও বটে এই মেয়েটা। দোকান খুলিয়ে সাত সকালে···

রিং হচ্ছিল। সম্যক্তা অনির্দ্দেশ্যভাবে চোখ বোলাচ্ছিল আমূলস্প্রে, নন্দর চাররঙা ডটপেন, নন্দ, উইস্পারের প্যাকেট, ভিকসের ঝুলন্ত বিজ্ঞাপন এবং অর্থহীন সব রঙ চঙে অসুখের বিবরণে। আবার নন্দ। "নন্দদা মায়ের সর্দিটা কিছুতে সারছে না গো, কি ওষুধ"

ফোন ধরলেন এক মহিলা। হঠাৎ সম্যক্তার গয়ংগচ্ছ কণ্ঠস্বর টানটান। "ফোর এইট ফাইভ এইট টু ওয়ান? পাশের বাড়ী থেকে কাইণ্ডলি ঋদ্ধিকে একটু ডেকে দেবেন?"

ঝাড়নে কাউণ্টার পুঁছতে পুঁছতে ("ভিক্স ফাইভ হানড্রেড ট্রাই করে দেখতে পারো") নন্দর কান খাড়া। ঋদ্ধি। রি-দ্-ধি? অঃ।

মহিলার গলায় অবিশ্বাসীর বিস্ময়। "ঋদ্ধি?" সাতসকালে রমণীকণ্ঠ ঋদ্ধিকে ডাকছে। এটা একটা ঘটনা।

ফোন ধরে সম্যক্তা ফের ভিকোরিলে ফিরে এসেছে। টিন্‌চিন্ করছে কোথায় যেন ভিতরে। ঋদ্ধি কি খুব দেরী করবে? প্রথমে ঠিক কি বলবে ও? "ঘুমোচ্ছিলি?" নাঃ ভারী ক্যাবলা প্রশ্ন। সরাসরি "আজ বিকেলে তুই ব্যস্ত?" "চারটে ভিকোরিল তাহলে দিয়ে দিও নন্দদা।") অথবা—"হ্যালো?"

ঋদ্ধি ফোনটা ধরেছে। নির্ঘাৎ ঘুমোচ্ছিল। চোখ আধবন্ধ গলার স্বরে অল্প একটু জড়তা আন্দাজ করতে হয় সম্যক্তাকে। না, আসলে ওর গলাটাই ভারী? "ভরাট কণ্ঠস্বর।"

"ঋদ্ধি?" নিজের গলায় একটা টান টের পায়। আর সেই মুহূর্তে মাথার মধ্যেটা একেবারে শুনশান মধ্যদুপুরের মাঠ। এখুনি ঠিক কি বলবো ঋদ্ধিকে? কি বললে প্রমাণ হবে ঋদ্ধিকে এই সাতসকালে পাশের বাড়ী থেকে ডেকে আনার গুরুত্ব? ঘুম থেকে তুলে আনার? ঠিক কি যে বলার ছিল? কিস্সু মনে পড়ে না।

ঋদ্ধি মনে হয় টেলিফোনের ওপাশে সামান্য বিস্মিত। হয়ত একবার পা বদলে নিয়ে দাঁড়াল। "ও তুই! বল্।" আড়ষ্ট গলা। প্রত্যাশিত কোনো জরুরী তথ্য। নইলে অসময়ে ফোনটার তো একটা মানে আছে।

সম্যক্তারও তাই ঠিক ছিল। কথার বাঁধুনিটা তৈরী করে দিত আশু প্রয়োজনটাই। অসম্ভব তাগিদ নিয়ে এমন গুছিয়ে বলতে হত কেন কেবল ঋদ্ধিকেই ঘুম থেকে তুলে আনার ঝঞ্ঝাট নয়, নিজেকেও মিনিট কুড়ি আগে তৈরী করে বাড়ী থেকে বের করে আনা...

উঃ, কি ভীষণ দেরী হয়ে যাচ্ছে কথাগুলো গুছোতে। ধুত্তোর। দুম্ করে সম্যক্তা বলল—"এই, আজ দেখা হবে?"

কখনো কখনো এমন ঘটে, কোনো দূরের সম্পর্কের, অল্প চেনা মানুষজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, আচমকা একটা মাতাল ট্যাক্সি, বা কোনো ভ্রূক্ষেপহীন পদচারীকে এড়াতে গিয়ে হিসেবে ভুল হয়ে যায়, আর শরীরে শরীর মিশে যায়। ঠিক ধাক্কা নয়, বেড়ে ওঠা ঘনিষ্ঠতার মতন বোধ হয়। তারপর কি বিশ্রী অস্বস্তি। আচমকা সব চুপচাপ। নিজেদের গুছিয়ে. কিছুই হয়নি

যেন এভাবে পুরনো কথার সুতো খুঁজে নিয়ে ফের শুরু করা কি ভয়ানক কঠিন হয়ে পড়ে? ঠোঁট কামড়ায় সম্যক্তা। ইশ্।

এবার ওদিকে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

ভয়। এর নাম ভয়। পরপর কয়েকটা চিন্তা হাত ধরে ঢোকে সম্যক্তার মাথার মধ্যখানে। যত বয়স হচ্ছে তত বোকা হচ্ছিস্? নইলে এ ভুল করবি কেন? নাকি চতুর্দিকে অজস্র লোকের সাথে গুছিয়ে কথা বলার অভ্যাসে এত পোক্ত হয়ে উঠেছে বলেই এ মুহূর্তে সেসব থেকে পলায়ন? ঋদ্ধির কাছে শেলটার? কেন, তুই কি প্রেমে পড়েছিস্ নাকি ওর? নাহলে শেষ মুহূর্তে সব সভ্যভব্য রীতি এলোমেলো করে সকাল আটটায় এ কি অসংলগ্ন শব্দচয়ন?

মুহূর্ত দুই পরে ঋদ্ধির কথা।

"ইয়ে, না, মানে শোন্, কি ব্যাপার বল্ত?"

দর্দান্ত রসবোধের জন্য ঋদ্ধির নাম ছিল। গলায় ওই হাসির রেশটাই বলে দিচ্ছে ও ঘটনার এই উদ্ভট মোচড়টা চমৎকার ভাবে ধরে ফেলেছে। ঋদ্ধি, দিবি না আমায় শেল্টার?

না, প্রশ্রয় দেবে না ঋদ্ধি। হাজার হোক্, র‍্যাশনাল এ্যানিমাল। যুক্তিযুক্ত একটা কারণ চাই।

উচ্চারণে আসে না সঠিক শব্দগুলো। "কি ব্যাপার বল্ তো?" কিচ্ছু ব্যাপার না রে ঋদ্ধি, জাস্ট তোর সঙ্গে আড্ডা দিতে ইচ্ছে করল। আমার, জাস্ট! কিন্তু কৈফিয়ৎ একটা চাইই। বুঝিয়ে বলতে হবে সব।

"না, এমনিই আসলে সন্ধ্যায় আমার হাতে অল্প সময় রয়েছে, আর তুই বলেছিলি আগামীকালই বোধ হয় তোর দিল্লী যাওয়ার ব্যাপারটা। তাছাড়া আমার কাছে তোর একটা জিনিষ পড়ে আছে—ঐ ছাতা সেদিন···মনে আছে? না মানে তোর যদি আজ সন্ধ্যায় কোনো বিশেষ কাজ না থাকে···"

ঋদ্ধিকে ব্যাখ্যার ব্যাকরণে আপ্লুত করে দিতে দিতে ও টের পেয়ে যায় পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। সাহসিনী নই, বলতে পারি নি সকালে উঠেই তোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল তাই, আজ তোর যাবার আগে তোকে দেখতেও ইচ্ছে হল, আর তাছাড়া কাল রাতে তোর একটা স্বপ্ন দেখেছি, জানিস্?

ছি, বাড়াবাড়ি হয়ে যেত। কিন্তু এখন ছাড়াছাড়িই হয়ে গেল যে?

বাক্‌ভঙ্গীতে ঋজু আর তুখোড় ভাবটুকু নেই। আবেগাপ্লুতা ভাবছে আমাকে ও। নিশ্চয়ই ভাবছে। কি লজ্জা। ছ্যা ছ্যা।

"আহা, বুঝলাম, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমার কয়েকটা কেনাকাটার প্ল্যান ছিল, জানিস্ তো। আর তাছাড়া প্রবালরা আসবে সম্ভবতঃ। ওরাও বোধহয় বিদায়টিদায় বলতে চায়। তোরা কি ধরেই নিচ্ছিস্ আমি দিল্লী থেকে আর ফিরছি না, হ্যাঃ?"

হাসছিল ঋদ্ধি। কিন্তু কণ্ঠস্বর অপরাধ বোধে উপ্‌চে পড়ছে। তাছাড়া সম্যক্তাও কোনো কথা বলছিল না। পায়ের তলা থেকে মাটি তাহলে তোরও সরছে, ঋদ্ধি?

"আর হ্যাঁ, শোন্ ঐ ছাতাটা এক্ষুনি আমার দরকার নেই—দিল্লীতে বৃষ্টিটিষ্টি হয় না—টেম্পারেচার বেয়াল্লিশ চলছে!"

সম্যক্তা চুপ।

সত্যি আমাদের বয়স বেড়ে গেছে রে। এখন আমরা কৈফিয়ৎ ছাড়া এক পাও চলতে পারি না। আর সেগুলো বানানো শুনতে হয়। অথচ আবেগগুলো তেমনি কাঁচা কাঁচা—না, দগ্‌দগে—কাপড়ে ঢাকতে ঢাকতে

"কিরে, খচলি?"

"না না, অসুবিধে তো থাকতেই পারে।" জোর করে হুল্লোড়ে গলা বার করতে হচ্ছে সম্যক্তাকে "আর শোন্, দিল্লী গিয়ে কোনো পাঁইয়া মেয়েকে ইলোপটিলোপ করিস্ না···।"

"কিন্তু ওরা আবার শুনেছি সাংঘাতিক। আমাকে যদি কেউ ইলোপ করে?"

গণিতে ফেল করে এবার রসায়ন। লড়ে যাচ্ছে টেলি-

ফোনের দুদিকে ব্যাখ্যা আর কৈফিয়তের কাছে দায়বদ্ধ দুই ইশ্‌কুল পালানো ছোঁড়াছুঁড়ি যেন।

"রাখছি।" রিসিভারকে হাসিতে কাঁপাতে চেষ্টা করে হঠাৎ সম্‌যুক্তা স্বমহিমায় গরিয়সী। মানে বীতশ্রদ্ধ।

"এই এই দাঁড়া শোন্‌ আজ ছটা নাগাদ তুই হিন্দুস্থান রোডের সামনের রোল কর্ণারটাতে থাকবি ;"

এবার ঋদ্ধি উল্টোমুখ। ছাড়ো ছাড়ো আঁচল বধূ, যেতে দাও। বধূ মানে বন্ধু, নিছক বন্ধু। আমাদের কলেজে দুটো ছেলেমেয়ে রাতদিন প্রেম করত। হরদম পেছনের বাগানে ওদের ঘনিষ্ঠ দেখেছি। তবু শুভ্রা বলত দীপের সঙ্গে নাকি ওর নিছক বন্ধুত্ব।

"ছটায় হবে না।" নিজের মধ্যে প্রবল নিষেধাজ্ঞা "বাদ দে বাদ দে। তুই ফিরে আয়, আড্ডা হবে। টাটা ?"

ঘটনার সমস্ত রশি সম্‌যুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া হাতে। আর ঋদ্ধিও সজাগ, সাব্যস্ত। "আমি টেন্‌থ ফিরছি। এসে যোগাযোগ করব। ওকে, সী ইউ! কু—উল!"

টেলিফোন ছাড়ার আগের মুহূর্তে আমাদের দুজনেরই গলা ফিরে এসেছিল সেই সচেতন; মোলায়েম অথচ শান দেওয়া চর্চিত ভঙ্গীতে। এবার দিনটা পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। ভোরের ভুলচুক নিকিয়ে নিচ্ছি এবার। বাসগুলোতে ভীড়। সামাজিক জ্ঞানগম্যির খুচরো বিনিময়। সকালের দিকটার আঁচলের নক্সা ক্রমশঃ ঘোলের বুটিহীন উফতার দিকে হাঁটছে সম্‌যুক্তা। কাঁধের ব্যাগটাকে তুলে নিল আদ্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গীতে। একটা সিগারেট ধরালো ঋদ্ধি। সমস্ত দিনটা সামনে পড়ে আছে।

দুপা নিরবচ্ছিন্ন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ফুটপাত পেরোনো। বাস স্টপ। হঠাৎ গান গাইতে ইচ্ছে করছে কেন ? ঋদ্ধিটা কি বোকা! আমি বোকা নই ? কি করলাম এটা ? প্রমাণ হয়ে গেল মূর্খতা।

স্পেশাল বাদের কমলা হলুদ শরীরটা ধারালো হয়ে চিন্তাকে বিখণ্ড করে। দৌড়ে গিয়ে, হাতল ঘুরিয়ে, দরজা খুলে, বাসে উঠে, সীট পাওয়ার সম্ভাবনা পর্যালোচনার পর, একজন সুন্দরমত লোক সামান্য টেরিয়ে ওকে দেখছে দেখে সজাগ, গাম্ভীর্য নেওয়া ভদ্দর মহিলাটির মতন ও দাঁড়িয়ে পড়ে। বাতাসে মৌরির গন্ধ। বুকের মধ্যে চুলের মত অস্বস্তির খচখচ। ঋদ্ধি কি ভাবল।

কফি হাউসের টেবিলের আলাপ। রোজ দেখাশুনা। হা হা, হৈ হৈ। পাঁচজন মিলে একটা থামস্‌ আপ। টেব্বিল বাজিয়ে গানবাজনা। তারপর বহুদিন বিচ্ছিন্ন। এই সেদিন শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে আবার দেখা। দুই পুরনো পাপীর গদভাষণ। একদিন আয় না আবার কফি হাউসে। আড্ডা দেওয়া যাক।

স্টেশনে ঢুকতে ঢুকতে সম্‌যুক্তা আড়চোখে দেখল কৃষ্ণনগর পাঁচ নম্বরে দিয়েছে। বোর্ডের লাল অক্ষর চোখ থেকে মেলাবার আগেই লড়াই শুরু। পঞ্চাশটি ভেতো, ভুড়িওলা, গতিতে ধাবমান বাবু বনাম সম্‌যুক্তা। বাবুবৃন্দের শরীরে ঘামের গন্ধ। মনে হাজারো পাপ। মুখের ভাব নিরেট।

স্রোত, বনাম প্রতিক্রিয়া। দুই কনুইয়ের ঠেলায় দুই দিকের মানুষগুলোকে নেহাৎ আমানবিকভাবে হঠিয়ে রাখতে রাখতে পাঁচনম্বরের দিকে। চোখ বেঁধে নিলেও সম্‌যুক্তা এখন এক দুই তিন চার পাঁচ সমস্ত প্ল্যাটফর্মে চলে যেতে পারে অবলীলাক্রমে নির্ভুল পায়ে। ঋদ্ধি কথা রেখেছিল। সম্পৃক্তাও। আশ্চর্য ব্যাপার। পাঁচ মিনিট থেকে এতটা ? না, আসলে বয়স তো বাড়ছেই। আর বাড়ছে স্মৃতিচারণ। সে সন্ধ্যাটা চিকেন ওমলেট আর দুটো ঘণ্টা আর পুরনো গল্প। ইশ্‌ আগে কোনোদিন ইনফিউশন আর পকোড়ার বেশী কিছু খেয়েছি ? পৃথা সেই জন্মদিনে—কোবরেজি—টেবিল জোড়া দিয়ে—এত চেঁচিয়েছিলাম পাশের টেবিলের লোক চুপ করতে বলেছিল—

অনুপমদা। অ্যাকাউন্টস্‌-এর। না দেখা হলেই ভালো হত। এবার ওঁর সঙ্গে সামনের কামরায় ওঠো। সিগারেটের ধোঁয়া। ডিভ্যালুএশন তত্ত্ব পর্যালোচনা। অবশ্য লেডিস্‌ কামরাইবা কি এমন সুখপ্রদ। সচরাচর থাকে ইতিহাস দিদিমণিদের সমাবেশ। যে সীটেই বসুক ঠিক এক প্রস্থ দিদিমণি। তারপর গান্ধীপরিবার থেকে কাঞ্জীভরম।

সেখানেও পর্যালোচনা।

অনুপমদার সঙ্গে গুটিগুটি ট্রেনে উঠে, জানালার ধারটা গুরুজন বলে ওঁকে ছেড়ে দিয়ে, সম্যক্তা ফের গুটিয়ে যায়। পরের আড্ডাটা কবে ছিল? নিজের কথা বলতে শুরু করেছিল সেদিন ঋদ্ধি। ভেতরের কথাগুলো। জানিস্, এতো একা হয়ে যাচ্ছি দিন দিন। এখন সব উল্টোপাল্টা চিন্তা মাথায় আসে। উদ্ভট সব মেয়েদের প্রেমনিবেদন করে ফেলি। বয়সও হয়ে যাচ্ছে। টুয়েল্‌ভে পড়া খুকীদের দেখলে বাৎসল্যরস জাগে। অথচ আমার বন্ধুগুলো ওরকম সব মেয়েদের শিখিয়ে পড়িয়ে প্রেম করছে।

আমারও ঠিক তাই। কিছুদিন আগে হট করে এক সিনীয়রের প্রেমে পড়ে গেলাম। কোনো মানেই হয় না। লোকটা কম্পুটার ছাড়া কিছুই বোঝে না। এদিকে বাবা মা লুকিয়ে আনন্দবাজারে অ্যাড দিচ্ছে।

তোর গানটান চলছে?

না। অ্যামেচারিশ্ কিছু করতে ইচ্ছা হয় না। সব হারিয়ে যাচ্ছে রে।

"আচ্ছা সম্যক্তা, সেদিন নাগের কথাগুলো শুনেছিলে?"

"নাগসায়েব? না তো।"

"লোকটা এক নম্বর ধড়িবাজ। নেক্সট মিটিং-এ ওকে টাইট দিতে হবে। আরে, এম ডিকে ত্যালাচ্ছিস্ কেন এত? ও তোর বাপ?"

জানিস্ ঋদ্ধি, এমন ধেড়ে ধেড়ে লোকের সঙ্গে সারাদিন এমন সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। মাঝে মাঝে নিজেরই অবাক লাগে। ভয়ও হয়। একটা বয়সের পর মানুষ আর বড়ো হয় না। বুড়ো হয় শুধু।

"কথাকলি অফিসে আসে?"

"আঠাশ তারিখ থেকে ছুটি নিয়েছে।"

"আরে, আমিও তো তাই বলি। একটা মেয়ে যতই মডার্ণ হোক্ পাঁচ মাসের পর অফিস্ করতে পারে?"

আশ্চর্য সব ভুল ধারণা নিয়ে চলতাম তখন। ভাবতাম পরচর্চা মেয়েদেরই একচেটিয়া। আদৌ তা নয়। ভদ্দর-লোকরা যা গসিপ করে।

"তারপর বলো সম্যক্তা, তোমার বিয়েটা লাগছে কবে?"

"ঠিক নেই।"

"তবে যে সেদিন উপল বলছিল…"

আমার সব উত্তরই "এক কথায় উত্তর দাও"। ঋদ্ধি, আজ সন্ধ্যায় তোর দিব্যি সময় ছিল। আড্ডাটা দেওয়া যেত। আসলে তুই ভয় পেলি যদি তোর প্রেমে পড়ে যাই। ঘরপোড়া গরু তো?

"বালাটা কোথা থেকে কিনলে? বেশ সুন্দর তো?"

আবার সাজগোজও লক্ষ্য করে। আপনাকে দেখানোর জন্য গয়না পরি নাকি মশাই?

কেন এমন সব নিয়ম পৃথিবীর, যাদের সঙ্গে বেশী সময়টা কাটে তাদের মনের সঙ্গে আমার চিন্তার কোন বৈধ আঁতাত হতে পারে না। কেন সম্যক্তার পাশের টেবিলের সহকর্মীর সঙ্গে আমার মানবিক দূরত্ব কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ? কেন রূপুদির মতন অস্বাভাবিক সুন্দর মানুষের সঙ্গে ঋদ্ধির দেখা হয় দুবছরে মাত্র একবার!

রূপুদি আরও একবার ফ্ল্যাট পাল্টেছে। ব্যাঙ্গালোর থেকে গোয়া গেছিল বেড়াতে। এ বছর কলকাতা আসবে কি না ঠিক নেই। পৃথিবীতে যত ভালো জায়গা আছে, রূপুদির কলকাতার ফ্ল্যাটটা ছিল তার মধ্যে দি বেস্ট। তখন ঋদ্ধি ফার্স্ট ইয়ারে। প্রথমেই মনে পড়ে টেবিল ল্যাম্পের সেই ঘনিষ্ঠ আলোর বৃত্তটা।

কাঁধে ব্যাগটা তুলে নিয়ে ঋদ্ধি রাস্তায় নামে। পকেট হাতড়ে কুড়ি টাকা পেল। আজ আর কিছু কেনা হবে না। বেকার যুবক আর কারে কয়। অথচ ঋদ্ধি খারাপ নেই। আপাততঃ বুকের মধ্যে স্নিগ্ধতম প্রশান্তি। পড়াশুনো, কলেজ স্ট্রীটে ঘোরাঘুরি, পাথরের বুকে আঁচড় কাটার কয়েকটা চেষ্টা। এভাবেই দিনগুলো এখন কাটুক। তারপর দেখা যাবে।

ভবানীপুরে নিলয়ের বাড়ীতে ক্যাসেটের কালেকশনটা দেখতে যাব এখন। সেটা দেখে, কয়েকটা গান শুনে, ঘুরে ফিরব অঞ্জনদার ঠেকটা।

বাসের মধ্যে ঘামতে ঘামতে ঋদ্ধি ভাবে—মোমবাতির আলোর মত বুকের মধ্যের ঠাণ্ডা নরম আনন্দটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। এত ভাল লাগছে কেন আজকে সকালটা? নিজেকে সফল, স্বাধীন, নির্ভার মনে হচ্ছে জ্বর থেকে সেরে ওঠার পরদিনের মতন।

কাগজটা একটু দেখব? অফিস যাত্রীর হাত থেকে আজকালটা টেনে নিয়ে দেখল ঋদ্ধি। প্রথম পাতা, শেষের পাতা। আর কয়েকদিনবাদে খুন জখম পলিটিক্স চলে যাবে শেষের পাতায়। এই একই রদ্দি মাল পাবলিক আর কত খাবে? সামনের পাতায় থাকবে শ্রীদেবীর মেনোপজ নিয়ে স্টুপ।

এবার বোঝা গেল। খুশীভাবটা সকালে সম্যক্তার ফোন থেকে। হাওয়ায় উড়ন্ত বুড়ির চুলের মতন আলতো সুখ। সম্যক্তা আমাকে চাইছিল।

একটা ঝগড়া লেগেছ। শুরুটা হয় সামান্যই। শেষটা? আর হয় না। একটা বাজখাঁই গলা মহিলাকে ট্যাক্সি চেপে কাজে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া আর কাকে বলে।

সম্যক্তা আমাকে চাইছিল বলেই শুধু না। আমি যে না বলে দিতে পারলাম এটাও দিব্যি। নিজস্ব স্বাধীনতার একটা সংলিপ্ত ব্যবহার। চমৎকার আত্মবিশ্বাস আনে।

তীর্থর বাড়ীর স্টপে নামে ঋদ্ধি। একটা সিগারেট কেনে। আড্ডা দিলে মন্দ হত না। তবু একটু চাহিদা, একটু ফাঁক থাকা ভাল। প্রাচুর্য ব্যাপারটাই ক্লান্তিকর। ঋদ্ধির চাদ্দিকে ভালো গান, ভালো বই, ভালো বন্ধু অনেক। মিলান কুন্দেরাটা শেষ হয়নি এখনও। তীর্থর গানের কালেকশনটা দেখব আজ। প্রবালরা আসবে সন্ধ্যায়। কাল রাজধানী। জে এন ইউতে ইন্টারভিউ। দেখা হবে সুকান্তর সাথে। হয়ত সুকান্ত পুরনো দিল্লীর গলিখুঁজিতে নিয়ে যাবে। শূল্যমাংস, বীয়ার। এত ভীড় করে আসা অর্থময় ঘটনার মধ্যে আবার সম্যক্তার সঙ্গে আড্ডা? মুখ মেরে আসত মনে হয়।

সিগারেট ধরায় ঋদ্ধি। দিনটাকে মোটামুটি সঠিক পদক্ষেপে পেরোনো যাচ্ছে। সাত সকালে একজন বান্ধবীকে ফিরিয়ে দেওয়ার সাহসিকতাটুকু বেশ রোমাঞ্চকর। সিগারেটের খুচরোটা ফেরৎ-নিতে-ভুলে-গেছে ভাব করে হাঁটল ও। গুরু!

* * * *

সম্যক্তা বাড়ী ফেরে সাড়ে সাতটায়। সন্ধ্যা তখন একটা গুমোট বোরখার তলে ঘামতে ঘামতে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। মাথাধরা মানুষের খোলা চোখের মতন সব হলদে আলোর সপসপে হয়ে থাকা রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে সকালটাকে বহুদূরের মনে হয়। অন্য জগতের। হাসে ও। সামান্য পুব বাতাস, গালে পাউডার বুলোনো তেলচিটে আকাশ, মাখন টোস্টের মায়ালু গন্ধ, ট্রামের শব্দ—এসব ঢং নিয়ে আসে বলেই কি সকালগুলো এত পাত্তা পায়? অথচ আসতে না আসতেই তো ফুস্। বাকি দিনটা দিয়ে খালি ঐ একটা অতীত সকাল আর একটা ভবিষ্যৎ সকালের মধ্যে জোড়াতাপ্পি। রাতে ব্লাউজ ইস্তিরি করে রাখা। বাসনে জল ঢালা। পায়ের আঙুলে সাবান ঘষা। সব ঐ সকালগুলোর জন্য। যাতে নিজেকে শুদ্ধ, পবিত্র মনে হয়?

কিন্তু আজ সকালে ঋদ্ধিকে কি যেন কি ভেবে, বাচ্চার মত ঝোঁক বশে, ফোন করে বের হলাম। সেটুকু ছাড়া ও সকালটার তো আর কোনো সত্তাই নেই।

ঋদ্ধিও এখন বড় দূরের, ক্ষয়ে যাওয়া, আলোর তলায় চাপা পড়ে যাওয়া অল্প আলোর মতন। সুজাতার সঙ্গে বিকেলে একটু ক্ল্যাশ হল! এমনিতে দিনটা ভালোই ছিল। একটা মিস্হ্যাপ ম্যানেজ দিয়েছে প্রদীপ। ছেলেটা বেশ মজার। বাচ্চা ছেলে, ইউনিক্সটা কিন্তু ভালোই জানে। নাঃ, আজ ঋদ্ধিটিদ্ধির সঙ্গে আড্ডার প্ল্যানটা এক্জিকিউট করলে বেশ ট্রেনই হত।

কাপড় ছাড়তে ছাপড়ে খেয়াল হল, ঋদ্ধির সঙ্গে কথা

বলারও কিছুই ছিল না। দুজনের চলাফেরার বৃত্তদুটো এখন কটা বিন্দুতেই বা ছোঁয়? ঋদ্ধি স্বপ্ন দেখে, বই পড়ে। আমি চাকরী করি, মাস গেলে বাবাকে নিয়ে যাই ডাক্তার খানা। কিই বা বলতাম ঋদ্ধিকে? ব্যর্থ প্রেমের গল্প? আবার?

অথবা অঞ্জনদাও একটু পজিটিভ অ্যাপ্রোচ নিলে পারত। "তোদের কিস্‌স্থ হবে না" বলাটা সোজা। ওটাও তো ক্লিশে। আচ্ছা অঞ্জনদার ঘরের নকল গ্যেনি-কাটা ঝেঁপে দিলে হয় না? পাগল এক অঙ্ক প্রফেসরকে নিয়ে পড়েছে অঞ্জনদা এখন। আমার গল্পটা পড়েও দেখল না। নাঃ পরেরবার লেখাটা ফেরৎ আনতে হবে। আমার কাছে থাকলে ওটা আর কেউ পড়তে পারত।

কে পড়ত? রূপুদি তো নেই। কবিতার বইগুলো আছে শুধু—"তোকে দিলাম।" রূপুদির মধ্যে বেশ একটা ডায়নামিজ্‌ম ছিল। ওর ডিভোর্সটা অনেকের ভুরুতে ঢেউ এনেছে। একলা ঘোরাফেরা ওর, পাহাড়ে চড়ার হবি। রূপুদির মত মেয়ে হয় না।

আর কেউ নেই আমার গল্প পড়ার মতন। প্রবালরাও না। তথাকথিত গভীর বন্ধু। তবু দূরের। প্রবালও বদলে যাচ্ছে। সবাই-ই তো বদলায়। চাকরী করে। টাই পরে ফাস্ট ফুড খায়। কদিন বাদে বিয়ে করে।

মেনে না নিয়ে উপায় নেই। প্রবালদের সঙ্গে আড্ডাটাও আজ কেমন ঝুলে গেল। ঋদ্ধি ঠাণ্ডা ভাতে হাত চালায়। টেবিলের অপর প্রান্তে মা। রোজ এত রাত করিস্ কেন? অপরাধীর মত হাসি। যাঃ, দিনটা শেষ হয়ে গেল। এগারোটা বাজতে পাঁচ। এখন খানিকক্ষণ বই পড়া যেতে পারে। কতদিন চিঠি লিখিনি কাউকে। লেখার কেউ নেই।

সম্যক্তা? সকালে ফোন করেছিল, না? ভালো মেয়ে। ভালো বন্ধু। বন্ধুই। বন্ধুর কোনো সেক্স নেই। ছেলেই হোক, আর মেয়ে, অর্থ পাল্টায় না। নাকি পাল্টায়?

কুটু, শুতে যাবার আলো জানালা বন্ধ করে যেও। আমি শুয়ে পড়লাম।

মা চলে যায়। পাখার শব্দ। পকেট হাতড়ে দেখে দেশলাই নেই। প্রবালই সম্ভবতঃ। এখন উঠে গিয়ে রান্না ঘর থেকে দেশলাই আনতে হবে? থাক্ গে।

সম্যক্তা আমার কেমন বন্ধু? না জ্বলা সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে ঘোরাতে ঘোরাতে ভাবে। মেয়েটা কেমন, ঠিক ঠিক ভাবে? হয়ত একটু বোকা। সামান্যই বোঝে। কদিন বাদে পয়সাটয়সা জমিয়ে একটা ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করবে। তারপর দুজনেই মধ্যপ্রদেশ স্ফীত হতে থাকবে ক্রমশঃ। সানন্দা ছাড়া আর কিছু পড়বে না। চাকরীতে ফাঁকি দেবে। ছুটিতে চাঁদিপুর। বাচ্চা হবে।

কিন্তু এখন তো সে সব হয় নি। এখনও তো ওর কোমরের দিকে তাকানো যায়। ও তো বিয়ে করে নি এখনও। ও তো সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। সেদিন আড্ডা দিয়ে বেশ ভালোও লেগেছিল। একটু ট্রাই করলে হত না? খুঁজে দেখলে হত না ওর ভেতরে? সব মেয়ে রূপুদি হবে না জানি, তবু?

না, আমিও তাহলে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আমিও আবার এক্সপেরিমেণ্ট করতে ভয় পাই? সম্যক্তাকে আমার লেখাটা পড়াতে পারতাম কি? সাহসে কুলোতো?

সত্যি আমার বয়স হয়ে গেছে। ঋদ্ধির সঙ্গে মাত্র তিন দিনের ঘনিষ্ঠতা। তাইতেই ওর প্রেমে পড়ার মতন হাঁক-পাঁক করে কি সব মাথামুণ্ডু বললাম। শুধু শুধু দেড়টা টাকা গচ্চা। আসলে আজকাল লোকজনকে পেলেই আঁকড়ে ধরি।

তাছাড়া ওকে নিয়ে কিই বা করব? কোথায় রাখব ওকে? আমাদের কি বন্ধুত্ব হয়? শুধুই ক্লাস স্টাগল।

ঘুম পেয়ে গেছে। কাল আবার অফিস। চিরুনীটা হাতেই থেকে যায়। চুল আঁচড়ানো হল না। ইশ্, দিনটা শেষ হয়ে গেল।

আমার প্রেমিকার জন্য ঃ ইডিপাস ও অন্যান্য রচনা

● বিবেক সেন

১.

একদিন রুপালী নক্ষত্রপথ বাহিয়া তাহারা আসিয়াছে, নীলাভ শরীর ঈষভ স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, তাহাদের পেলব শরীর, মরাল গ্রীবার ন্যায়, পাখির বক্ষের সদৃশ। নক্ষত্রের রাত্রি তুমি জান না, এত আলো, এত দৃশ্য, পৃথিবী ও উদ্ভিদ এত সৌন্দর্য্যের ভিতর দ্রাব। নিশীথ তাহার মায়াবী জঠরের ভিতর মানুষকে গ্রাস করে। সে জাগিতে পারে না।

তাহারা নায়িকা নয়, তাহারা শৃঙ্গার অলক বাঁধে না। তাহারা বিদ্ধক-পীড়িতক জানে না। তাহারা রাক্ষসী, না-রমণী। তাহারা তোমার চেতনায় বাসা বাঁধে, তোমায় জাগিতে দেয় না। তুমি তাহাদের ভালবাসিয়াছ, তাহাদের কুজ্ঝটিকা অবয়ব—ভাসমান, শূন্যময়, নীলাভ ও গহন।

২.

নিশা অবসানের নম্র আলোর বেদনায় পৃথিবীর পথ ও আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে। নমনীয় বৃক্ষ ঈষৎ অবনত, প্রথম সূর্য রশ্মির আলিঙ্গনাবদ্ধ, তীক্ষ্ণ পাতায় জলবিন্দু, সুস্নান। তাহারা রাত্রি জাগরনের অবসাদ জানে না। সমগ্র রাত্রি তাহারা পৃথিবীর অন্ধকার ভালবাসিয়াছে, সে অন্ধকার ধারণ করিয়াছে পাতায়, ত্বকে, হৃদয়ের গভীরে। নর্মের ভিতর কথা বলিয়াছে মৃদু কুজনে বাতাসের শব্দের আড়ালে। সে প্রেমে ক্লান্তি নাই। সমগ্র দিবসের কর্মচাঞ্চল্যে, প্রাণোচ্ছলতায় ক্লেদ নাই। তাহাদের সে শরীরদানে গ্লানি নাই।

৩.

বর্ণহীন ধূসর মেঘলা, অকালের বর্ষাকাল. তাণ্ডব বাতাস ও সে মেঘলা তুলিয়া সূর্যের ঘুম ভাঙ্গায় না। উদ্ভিদেরা শীতার্ত ও তন্দ্রাতুর। বিষণ্ন মানুষেরা নারীদের কথা ভাবে। তাহারা ম্লান, মধুর ও ঋতুমতী। তাহাদের পুরুষেরা যুদ্ধ ও স্বর্ণ-সংগ্রহে স্বাস্থ্যবান, ঋজু, দৃঢ়, তাহারা ঘর্মাক্ত। পশু ও রমনীগনের দেবতা। বিষণ্ন পুরুষেরা এই সব ভাবে। রজঃস্বলা কুমারীদের জন্য তাহারা গৃহ নির্মাণ করে না, কর্ষণ করে না, বীজ রোপন করে না। ভারী আকাশের দিকে কাকের দল হাহাকার করে, আবর্জনার স্তূপ হইতে উচ্ছিষ্ট খুঁজিয়া লয়, মরা ডালে ঝিমায়। তাণ্ডব বাতাসেরা তাহা জানে, জানে শীতকালের পুষ্করিনীর জল। অনেক বেলায় যাহারা স্নান করে কুয়াশাচ্ছন্ন সে জলের কিনারায়, মৃদু গান গায়, তাহার শব্দ অস্পষ্ট, কেবল সুর শোনা যায়, সে সুর রক্তলিপ্ত পুরুষেরা বোঝে না, বিষাদের সে গান অন্য পৃথিবীর, রমণ—শীৎকার নয়। তাহারা হাসে, যেন আচমকা এক রাজহাঁস জল ছাড়িয়া ওঠে ডানার সংঘাতে। পানমত্ত পুরুষেরা রৌদ্র ভালবাসে, ভালবাসে গ্রাম্যপানীয়, গালগল্প, পাশা-খেলা, জুয়াখেলা। আয়নায় মুখ দেখিয়া সে রমণী প্রতীক্ষা করে অনেক অনেক রাত। তাহার রূপ হেমন্তের পর্ণমোচী বৃক্ষের ন্যায় বিবিক্ত; লঘু, ধূসর পাতা ঝরা বাতাসের বেদনা ও বিষণ্নতায় ম্লানতর হয় তাহার পার্শ্বরেখা, প্রাচীন ভাস্কর্য ক্ষয় হয় রৌদ্রে-জলে। ম্লান হয় ছায়া, না শিশির জমিয়া উঠে আয়নার কাচে। তাহার সে মুখ, সে ঋতুমতী শরীরের তরে আমার বিরহ।

৪

তাহার বাহু পুরুষালি, পেশীবহুল ও রোমশ, চায়ের পেয়ালায় টুং টাং মুর্ছনা সৃজনে ব্যস্ত পোষাকের প্রয়োজনীয় শব্দে। প্রেমিক তাহা অনুভব করে, সে শব্দ ও ব্যস্ততা জীবনের আগ্রহ, রিরংসা ও সন্তানাকাঙ্খা জন্মায়, যেন তাহা শাস্ত্রোল্লিখিত পানীয়—যৌনতাবর্ধক। তবু সে নারী কাঁদে, তাহার জারের নিকট, পুরুষটি ক্লান্ত হয় রমণীর শোক

ক্ষমতায় ও মানুষ হইবার ইচ্ছায়; ভাবে-ব্যবহারে সে রাঁড়ের ন্যায়—পৃথুলা ও কর্কশ, ভাবে—রমণীরা কেন পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করে না। যেহেতু তাহার সন্তানোৎপাদন হেতু বিপরীত মানবীর প্রয়োজন নাই; সে পূর্ণতার সন্ধানে তাহার কপোলে ওষ্ঠ দেয় ও তিক্ত অশ্রুপান করে দীর্ঘক্ষণ। আত্মরতি প্রবণ এ মানসিক আচমন তাহার এ প্রেম, শিল্পচেতনা—যেন সূচীকর্ম প্রিয়া বন্ধ্যার বাল গোপাল লইয়া পুতুল খেলা, রমনী তাহা জানে না, সে পূর্ণ মানবী হইতে চায়।

ইডিপাস

Let the bulldozers come. Is the old refused to die, the new could not be born.

Salman Rushdie.

তুমি ছিলে তাদের রক্তের ভিতর, যেন এক ভ্রূন জরায়ুর অন্ধকারে, সেইসব রিরংসা কাতর অপ্রেমিক রমন-রমনী। নারী বা পুরুষ নও, আকাঙ্ক্ষা করনি সে কিশোরীর প্রেম, যৌন শরীর, যে আবার তোমাকে জন্ম দেবে নিজের লালসায় তিল তিল পুষ্ট করে। আর পুরুষটি—তোমার পিতা, কৃমির মতন যার স্বর্ণ-নারী—উত্তরাধিকারীর বাসনা, তোমাকে জন্ম দিচ্ছে, যেমন জন্ম দিচ্ছে বীভৎস সঙ্গমে মহাযুদ্ধ, যৌন মহামারী। লুঠ করছে, ধর্ষণ করছে, নিজের নগ্ন, স্ফীত বিম্ব দেখে আয়নায় তৃপ্তি বোধ করছে। সে ধর্ষকামীর বিকট ছায়ায় ভীত গর্ভবতী ম্লান কিশোরী নিজেকে লুকিয়ে রাখছে ঘাসের আড়ালে, জলের আড়ালে, লুকিয়ে রাখছে তার কোমল করুণ স্তন, রক্তাক্ত যোনী। আর তোমাকে সৃজন করেছে এক কুমোর পোকার মতো আত্মমন্থনে।

উঠে এস অন্ধকার থেকে, প্রতিহিংসা পুরুষ হও, আকাঙ্ক্ষা কর সেই কিশোরীর প্রেম, যৌন শরীর, যে সন্তানের জন্ম দেয় নিজের লালসায় তিল তিল পুষ্ট করে। আর পুরুষটি—তোমার পিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বী, কৃমির মতন যার ক্ষুধা, তোমার শানিত অস্ত্রের করুণা কর তাকে তুমি, নির্বাসিত পুত্র তুমি ইডিপাস।

88847

চোখের আলোয় দেখেছিলেম

● তিতাস মিত্র

স্টুডিওয় ছেলেটি আপনমনে কাজে ব্যস্ত, মাথা নিচু।

'একটু শুনবেন!'

মাথা তুলে দেখলে। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা, গায়ে গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবী। মুখে খানিকটা বিস্ময়ের ছাপ। সামনে অচেনা একটি দল।

'জিতভূম' কোথায় বলতে পারেন?'

আঙুল তুলে পেছনে দেখালে আর সাথে আবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লে।

আমরা আশ্চর্যান্বিত, আমরা অবাক।

তার হাতটি অনুসরণ করে দেখলাম পেছনের দেয়ালে রক্তিম পলাশের রক্তিম উষ্ণতায় ভরা 'দোল-উৎসবের' একটি ছবি টাঙানো।

'ঠিক বুঝতে পারলাম না'।

'পেছনে, আমার স্টুডিওর ঠিক পেছনে।''

আমরা একটি সরে এসে দেখলাম চারপাশে বিশাল বিশাল গাছ ঘেরা একটি বাগান। একটি গ্রিলের গেটও আছে। কিন্তু সেটা বন্ধ। গেটের সামনে ঘাস গজিয়েছে। তার ওপর বহুদিন কোন পদচিহ্ন বোধহয় পড়েনি। আমরা বিস্ময়বিমূঢ়। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অগত্যা আবার ষ্টুডিওর সামনে এসে দাঁড়াই, ছেলেটি আপনমনে কাজে ব্যস্ত। এই আপনভোলা কাজীটিকে বিরক্ত করা উচিত হবে কিনা ভাবছি। এদিকে শেষবেলার আলোর রেশটুকু মুছে গিয়ে সন্ধ্যে নামছে শান্তিনিকেতনে। রাস্তার উল্টোদিকের দোকানের সামনে সামনে খদ্দেরের ভিড়। ব্যস্ততা। শুধু আমরা কজন পরদেশী দিগভ্রান্ত। আমাদের উপস্থিতি ঠিক মানানসই নয় যেন। মনের ভেতর কেমন একটা মনমরা গানের গুনগুনানি।

হঠাৎ দেখি তুহিনা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এই যে মশাই জিতভূমে কোন দিক দিয়ে ঢুকতে হয়?

ছেলেটি এবার মুখ তুলে চেয়েই একগাল হেসে ফেলল—'আমার ষ্টুডিওর পাশ দিয়ে যে মেঠো পথটি গেছে সেটা গিয়ে ধরে সোজা একটু গিয়েই দেখবেন ডান-দিকে একটা গেট। গেট পার হলেই ··

তুহিনা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'শুনেছি কুকুর আছে!'

'কোন ভয় নেই। আমরা তো চলে যাই।'

'না মানে একটু যদি সাহায্য করেন'—মার গলায় মিনতির সুর।

সোজা চলে যান। ভয় নেই। তবে সন্ধ্যেবেলা উঁনি প্রার্থনায় বসেন। শুনে ভীষণ ভালো লাগল। এখানে এঁরা পুজাকে বলেন প্রার্থনা—মন্ত্রপাঠের বদলে ধ্যান। ভোরের প্রথম কাকলি শোনার সাথে সাথে আবার পাখিদের নীড়ে ফেরার বেলায়—দিনমানের দুই সন্ধিক্ষণে একাগ্রচিত্তে আপন অন্তরের দেবতার কাছে প্রার্থনা।

আমরা দমবার পাত্র নই। নতুন উৎসাহে জোরকদমে এগিয়ে চললাম। মেঠো পথ, পিচ রাস্তা থেকে সোজা নিচে নেমে গেছে। ডানদিকে সরু একফালি পথ। তার সামনেই কাঠের ছোট্ট গেট। চারিদিক নিশ্চুপ। বাগানের ভেতর বাড়ীতে আলো জ্বলছে। ঢোকার সাহস নেই। সারমেয়! গেটে ইষ্টাঘাত করা হল। জোরে জোরে চিৎকার করারও উপায় নেই। আমি দুবার ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক দিলাম 'কেউ আছেন'? 'কেউ শুনছেন'? কোন সাড়া নেই। নিরুপায় হয়ে ফিরে এলাম।

আবার সেই ষ্টুডিও।

ছেলেটি বাইরে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখে বললে 'কাল সকালে আসুন না, এই আটটা নাগাদ—আমি নিয়ে যাব। পর দিন সকালে সূর্য ওঠে নি চারিদিক আলোকিত করে, কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে। তারই সাথে ঝিরিঝিরি

বৃষ্টি। চারিদিকের পরিবেশ বড়ো গুমোট, বড়ো অভিমানী। কাল বিকেলের যে ব্যথার সুর প্রাণে ধরে এনেছিলেম আজ সকালে তাই উদ্বেগ ও উত্তেজনায় পরিণত। বৃষ্টি শেষে আকাশ যখন অভিমানী সূর্য্য মুখটুকু তুলে হাসল ঘড়ির কাঁটা তখন দশটার ঘরে টিকটিক্ করছে। উচ্চৈস্বরে বেসুর গানের গলা খুলে দিয়ে সেই ষ্টুডিওর সামনে এসে দাঁড়ালাম,—তার দরজা তখন বন্ধ। নিরুপায় আমরা ভীরু পায়ে এগিয়ে চললাম 'জিতভূমে'র দিকে। আজ সূর্যদেব আছেন, আজ আলো আছে, আজ সব দৃশ্যমান। কাল সন্ধ্যার সেই দ্বিধা সেই অনিশ্চয়তা আজ নেই। দিনের আলোয় আজ সবকিছু অনেক পরিষ্কার। আজও গেট ধরে নাড়ানাড়ির কোন ফল না হওয়ায় গেট খুলে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম দুসারি গাছের মধ্য দিয়ে নুড়ির রাস্তা ধরে। সামনে গোল লাল বারান্দা। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ়। আমাদের আর্জি পেশ করতেই ভেতর থেকে শোনা গেল সুমধুর কণ্ঠস্বর 'এসো এসো'। দুহাত বাড়িয়ে যখন তাঁর পদস্পর্শ করলাম তিনি বললেন, 'তুমিই তিতাস?' আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এই ভেবে যে আমার আগেই আমার চিঠির সাথে ওঁনার পরিচয় ঘটেছে ও উঁনি আমায় স্মরণে রেখেছেন।

জল খাবারের পয়সা জমিয়ে প্রথম বই কেনা, কিংবা আমার লাগানো রজনীগন্ধা যেদিন সুরভিত করেছিল ছোট্ট বাগানকে—এসবের আনন্দে, এই দিনগুলির সুখময় অনুভূতিতে আমি যেমন আবেগে আপ্লুত হয়েছিলাম তার সাথে এই বিশেষ দিনটির কোন মিল নেই। এ যেন অন্য এক পাওয়া, অন্য এক অনুভূতি যা আমার শুধু আনন্দে ভাসায়নি, অশ্রুসজলও করেছিল।

এক বর্ষার সকালে 'জিতভূমে'র বৈঠকখানায় ওঁনাকে ঘিরে আমাদের বৈঠক, আলোচনার কেন্দ্রে ঘুরেফিরে অনুক্ষণ রবীন্দ্রনাথ, শিশু অভিজিৎ-এর আলাদীন, আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় আকস্মিক দীর্ঘদেহী সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় হিসেবে আবির্ভাব, স্নেহলালিত, শান্ত দুই বিশালাকায় সারমেয়ের আদর খাওয়া···এসব স্মৃতি আজও বারবার আমায় আনন্দ জোয়ারে ভাসাচ্ছে। আর বার বার মনে পড়ছে তাঁর সেই মধুর হাসি বা সব ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারে অপার শান্তির নীড়ে। আজও মনে হয় ঐ বৈঠকখানায় আমি আমার অন্তরের অনেক কিছু ফেলে এসেছি, আজও যেন ঘুরে ঘুরে দেখছি তাঁর আঁকা সেইসব অপূর্ব ছবি, আজও যেন তাঁর পায়ের কাছে বসে শুনছি—শান্তিনিকেতনের অতীত ইতিহাস তাঁর সাথে সাথে যেন আমিও ছুটছি আর হারিয়ে যাচ্ছি খোয়াইএর বুকে, আমিও যেন বৃষ্টিস্নাত হয়ে চলেছি কোপাই অভিমুখে, চলেছি বসন্ত উৎসবের রঙে রাঙা হতে, চলেছি গৌড়প্রাঙ্গণে জ্যোৎস্নারাতে অভিনয় দেখতে।

আমি আমার অটোগ্রাফের প্রথম খাতাটি, যাকে দীর্ঘ প্রায় একবছর আলমারির প্রতীক্ষাশালায় ন্যাপথলিনের গন্ধে সজীব থাকতে হয়েছে, তার প্রথম পাতাটি মেলে ধরলাম তাঁর সামনে যিনি অকৃপণভাবে মানুষ রবীন্দ্রনাথের উষ্ণ সাহচর্য, তাঁর স্নেহস্পর্শ, তাঁর স্নেহচ্ছায়া, তাঁর কৌতুকপ্রিয় মনের ছোট ছোট ঘটনাপঞ্জী আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন—রবীন্দ্রনাথের সেই নয় -রাণী—রাণীচন্দ। উনি লিখলেন—

'কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু
শুধাবো না কোনো পথিকে—
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু,
যখন ফিরিব যেদিকে।'

বললেন—'অষ্টাদশী তোমায় দিলাম আমার প্রিয় কটি লাইন।' সময় কখন এগিয়ে গেছে বুঝিনি। এখন মধ্যাহ্ন। এবার বিদায় নেবার পালা। আস্তে আস্তে যখন চলে আসছি উঁনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়লেন, নমস্কার জানালেন। কার উদ্দেশ্যে? জানি না হয়ত তাঁর সেই অপার, অসীম প্রভুর উদ্দেশ্যে! আমরাও নমস্কার করে যখন 'জিতভূমের বাইরে পা রাখলাম মনে হল এতক্ষণ কোন স্বপ্নলোকে ছিলাম, কোন কল্পলোকে।

জীবনে প্রথম এই কয়েক ঘণ্টা সময় তার পূর্ণতা পেল।

অসূর্য্যম্পশ্যা

● ঈশানী দত্ত রায়
স্নাতকোত্তর (২য় বর্ষ)

নিছক সাধারণত্বে
বেঁচে থাকা যন্ত্রণার,
কেউ যদি লেখে,
ভালো থেকো'—
যন্ত্রণা আবৃত করে
কোমল করতল।
মুহূর্তের অনিশ্চয়তায়
পাশাপাশি থাকার প'র
মধ্যবয়সী রমণী
বলেন—'সাবধানে যেও।'
শব্দই অনুভূতি চেনায়।
অজস্র
করতলে
ভালবাসা
থাকে,
তবু
অনিবার্য ভেবে,
ভালবাসা
জমিয়ে রাখা বন্ধনে।
জানি
সময়
এক
নিস্পৃহ
থ্রু-ট্রেন।
তার
ধুলো
ঢেকে দেয়
পুরনো-প্রতিদিন,
বুকের
ভেতর
তবু জমে থাকে
সমস্ত পুরনো বকুল।
চার স্টেশনের সহযাত্রায়
ফিরে
আঁকড়ে ধরি
কামরার হাতল,
ঠিকঠাক্ জায়গায়
খুঁজি
পুরনো মুখগুলি
প্রথম ভোরের মতো
মৃদু হাসে কেউ
দৃষ্টিতে কেউ,
ঘাড়ের ভঙ্গিতে
আলোড়িত করে যায়
'ভালো আছো তো?
ভালো থেকো।'
নিছক সাধারণত্বে
জেগে উঠি
ভালবেসে।

আরোগ্য

● ঈশানী দত্ত রায়
স্নাতকোত্তর (২য় বর্ষ)

এমনই ঘটে যায় পরপর,
হঠাৎ সিঁড়ির বাঁকে
ক্লান্তি পথ আটকায়
আততায়ীর মতো।
বুকের ভেতর
উনুনের ধোঁয়া,
তারপর, ভোররাতের মতো আচ্ছন্নতা
নিয়ে যায়
হাসপাতালের বেডে।
এমনই হয়।
যখন
ফুলদানীর
বাসী জলের মতো
দিন গড়িয়ে যায়।
আর ব্যথা ভরে ওঠে শরীরে,
যেমন
গুচ্ছ
গুচ্ছ
পাতায়
ভরে ওঠে কৃষ্ণচূড়া গাছ।
এমনই হয়
যখন
ঘুম ভেঙে জেগে
মনে হয়,
আগামী
চব্বিশ ঘণ্টা
টেবিলে
সাজানো
দৈনিক প্রাতরাশ
যন্ত্রণা বিদ্ধ করে,
ছুঁড়ে দেয় রোগশয্যায়।
সেখানে
নির্মোহ নির্জনতায়
নিজের সঙ্গে থাকা
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে,
ভেবেছিলে যাকে চেনো।

এমনই ঘটে যায় পরপর—
তারপরে ফিরে আসা,
পর্দা সরিয়ে ঢোকা নিজস্ব ঘরে।
ফিরে আসে
জানলার কাঁচে
বৃষ্টির মুখ,
এক ঝলকের মতো
বেগুনী ঘাসফুল—
আর
তুমুল ঝড়-বৃষ্টির প'রে
নাগরিক জীবন
একটি
রামধনুর মতো
এসে
দাঁড়ায়।

কয়েক ফার্লং জুড়ে

● অর্পণ চক্রবর্তী

কয়েক ফার্লং জুড়ে রোদ পড়ে আছে
কয়েক ফার্লং জুড়ে টুকরো কাগজ
অসংখ্য চিরকুটে রাংতায় গোল্লা পাকিয়ে
ছড়িয়ে যাচ্ছে রোদ ;
সীমান্তের পাখিদের পায়ে পায়ে ফুটবল হয়ে
অনন্ত উঠোন জুড়ে গমের বিছানায়
চক্‌চক্ করে উঠছে লাল-হলুদ লজেন্স

অনন্ত উঠোন দেখ ফাঁকা পড়ে আছে
অনন্ত উঠোনে দেখ আমি শুয়ে আছি
মুখের ভেতরে কত সাবলীল জিভ, দিকচিহ্নহীন
পোতের মতন লালাস্রোতে ভাসে, নড়েচড়ে

নড়েচড়ে ডেকে ওঠে ডোডোপাখি
বন্ধ দেরাজ থেকে ডাকে, আলমারী বাস্ক-তোরঙ্গ
মৃত মেহগনী গাছ থেকে ডেকে উড়ে গেল
কাঠের গরাদ খসা জানালার ফ্রেমে

উড়তে উড়তে কত লোভনীয় ছবি,
ল্যাণ্ডস্কেপে ভারী হয়ে খসে পড়ল
ক্যানভাসে আর ঢেলে দিল প্রথম তরল

ডেকে ডেকে গলে গেল ডোডো—
এতক্ষণ মৃত ছিল আমি তাকে সারিয়ে তুলেছি
ডানায় ডানায় তার পুরোনো পালকে ধুলো
আমার সমস্ত দেহময় ;
আমি অ্যান্টিক থেকে ধুলো ঝাড়ি, আর

দূরবর্তী স্মৃতি মৃত কোনো দ্বীপের অনেক ভেতরে
ভেতরে ভেতরে বসবাস
অনেক ভেতর থেকে বেজে উঠল ঘণ্টা
যেভাবে নষ্ট গাছ কাণ্ডে রাখে বয়সের দাগ
বীতরাগে ঠ্যাং তুলে শুয়ে থাকে একটি শালিক
যেভাবে আগুনের অজস্র ব্রণ ফেটে
মুখময়, মুখময় চুপ
সেভাবে কোথাও মন্দিরের ভেতর মন্দির
গম্বুজে গম্বুজ আর ঘণ্টার বয়স্ক ঠোঁট
শীতকালে ফেটে, চৌচির ফেটে
আর্তস্বরে সন্ধে নামাল
আমাকে প্রহরী ভেবে পায়ে পায়ে সন্ধিপথ ধরে
সীমান্তের কাছ বরাবর গিয়ে ফিরে এল।

স্বপ্ন দেখেছি আমিকে

● প্রিয়াংকা চৌধুরী

একটা জলন্ত চিতা দেখেছি সেদিন—
তারপর প্রতিরাতে আমি লুকিয়ে রাখি—বাবার ঘুমের বড়ি,
দাড়ি কামানোর ব্লেড, তরকারি কাটা ছুরি।
বাথরুমের এ্যাসিড বোতলটা জঙ্গলে ফেলে দিয়েছি
লুকিয়ে লুকিয়ে।—কাপড় শুকোনো দড়িটা করেছি
টুকরো টুকরো—আর কেরোসিন বোতল ?
সেটাও যে কোথায় রেখেছি ঠিক মনে নেই।
লুকিয়ে ফেলেছি সব যোগানদার—
মৃত্যুর নিশ্চিত শুভাকাঙ্খীদের

বালিশে মুখ গুঁজে শুতে ভয় হয়—
নিজের দশটা আঙুলকে শয়তান মনে হয়—
কতটুকুই বা দূরত্ব হাত আর গলার ?
দেওয়ালের কাছে, পাছে মাথা ঠুকে যায়
বড় একটা যাই না আজকাল।
আর স্বপ্ন দেখেছি—
মৃত্যুর পর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আমিকে
আত্মহত্যার অপরাধের দায়ে॥

জানি না

● সুমন ভট্টাচার্য

বৈশাখের সেই পীচগলা দুপুরটার কথা আজও আমার মনে আছে।
প্রচণ্ড গরমেও আমরা সবাই বাসষ্টপে ছিলাম
অলস ফেরিওয়ালা, ষাটোত্তীর্ণ বৃদ্ধ, কলেজ পালানো তরুণতরুণী আর আমি,
কলকাতায় কি লু ওঠে?
জানি না—
গরমের আঁচে কিন্তু আমরা ঝলসাছিলাম,
শীর্ণকায়, প্রতিবাদী একটি কিশোর এসেছিল
কখন খেয়াল করিনি
ওর পরনে কি হাল ফ্যাসানের জামাকাপড় ছিল?
জানি না—
কিন্তু ওর চোখদুটো, হ্যাঁ ওর চোখদুটো আমাকে টানছিল,
ও কি বলতে চাইছিল আমি বুঝছিলাম না,
ওর অস্থিরতা গ্রীষ্মের অস্থির মধ্যাহ্নে আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল
হঠাৎই ও দৌড়ে রাস্তা পার হতে গেল কেন?
জানি না—
যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ও,
বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং-এ চোখ রেখেছিল
স্বপ্নের জগৎ, মায়ার, প্রলোভনের জগৎ সেখানে
তারা কি ওকে লুব্ধ করেছিল?
জানি না—
একটা চাপা আর্তনাদ,
বাসের প্রচণ্ড ব্রেক কষার শব্দে সবাই ওর দিকে তাকিয়েছিল
কালো পীচের রাস্তায় ওর কালচে রক্ত সবাইকে চমকে দিয়েছিল
কারো গায়ে কি রক্তের ছিটে লেগেছিল?
জানি না—
কিন্তু এখনো ও আমার স্বপ্নে আসে,
মাঝেমাঝেই,
আর হঠাৎই ছেলেটার মুখ ভেঙেচুরে হয়ে যায় আমার মত।
কেন
জানি না।

হাট

● অচ্যুত মণ্ডল

কাছেপিঠে বহু দোকানের সারি মাঝে একখানি হাট।
সন্ধেয় পথে জ্বলে ওঠে আলো শুয়ে থাকে ফুটপাথ,
বেচাকেনা সেরে বিকেল বেলায় সকলে যে যায় ঘরে ফিরে যায়;
কাকের পাখায় কলেজ লুকায় ওড়ে একাকিনী স্কার্ট!
নিশানের মতো শ্রেণীহারা একা ক্লান্ত কলেজ স্ট্রীটে—
মিছিলের মতো কালো ছায়া চলে স্লোগানের হার্টবীটে
পুবের পুকুরে নিভৃতে শয়ান; জল জেগে উঠে দেবে না বয়ান।
রাত্রি কিভাবে আসীন হয়েছে কলেজের কক্ পিটে।
শুধু হাওয়া এসে বলে বাঁকা হেসে বাঁশি বাজবে না ইঁটে।
দুপুরে সেখানে কত কোলাহল, কত তাড়াহুড়ো—দেরি;
কত তির্যক কথা বেচাকেনা—ভোট যুদ্ধের ভেরী
পোর্টিকো জুড়ে ফ্রেস্‌কোর মতো পোষ্টারে যত মত তত পথও—
যত দোষ শুধু অনতিক্রম্য ধাবমান বিকেলেরই;
যেন ঋজু ছায়া ছাড়িয়ে গিয়েছে বিষন্ন লাইব্রেরি!
যেন কলেজের কপালে পড়েছে সময়ের চুলে ছাওয়া
ঐতিত্যের উকুনের মতো ইতিহাস খুঁটে খাওয়া
কিছু শালিখের কিচিরমিচির; কিছু এলোমেলো ভ্রান্ত রুচির
কিছু মানুষের কিছু মানুষীর—নিয়মিত আসা যাওয়া···
'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে' এই বিষাদ কাহিনী গাওয়া।

Towards Cleansing of the Debt-Ridden Third World Augean Stables : Some Alternative Solutions.

"So distributions should undo excess
And each man have enough"
KING LEAR, Act IV SC. I

The world economy has undergone major structural changes since 1973. Currently it is in deep crisis and, inspite of a slight upturn in the developed countries (DCS), the present-presentrecession continues to have disastrous consequences in the less developed countries (LDCS) with ubiquitous unemployment, depressed export earnings, slowing down of development and serious debt-trap situations. It is the last phenomenon in particular with which we shall be mainly concerned with. By the 'debt trap', we shall mean the virulent tendency of interest changes to acquire a life of their own, to become a Frankenstein's Monster no longer connected to the borrower's original purpose. As a consequence, the borrower country's debt income ratio rises explosively. Gradually the country gets sucked into a quigmire of economic insolvency.

THE SETTING :

In the twenties, Keynes rebuffed the nostalgia felt by many of his compatriots, insisting that the conditions prevailing before the First world had disappeared for good and the flexible, competitive caitalism and the age of laissez-faire had been left behind for ever. He considered that, under the new circumstances the economy needed a 'conscious direction' that would keep the system functioning as a 'reasonable capitalism' and would secure social stability by offering a 'conditioning framework that would adequately serve the changing process of compromise among the different groups. The result of all this have led, since the fifties, to a growing global interdependence among national economies based on the expansion of trade and investments favoured by the liberalization of commercial flows and capital movements and accompanied by the development of multi-national corporations. As long as a strongly expansionary elimate lasted, the development of international financial markets favoured the growth of the DCS, where external restrictions did not prevent the continuing advance of organizational capitalism. Around 1973, the vigour of growth impulses which had driven the Western Economy in the immediate post-war decades began to wane.

Anatomy of the Debt Crisis :

In 1974, there occured an upheaval in the world petroleum market as OPEC countries began rising the price they charged to their main customers. The first of a series of oil shocks led to an all-pervasive slowing down

of consumption and investment and the world economy was thrown into a recession. Because the price rise jacked up the import bill of oil importers, it worsened the current-account deficits of many countries. The overall current-account of the LDCs that were not major oil exporters moved from minus 11. 3 billion to minus 37 billion. By directly raising the prices of petroleum products and the costs of energy-uwing industries, the increase in the oil price caused a world-wide inflation. There was rampant stagflation as a result of expectations of future inflation that fed into wages and other prices in spite of recession and rising unemployment. The fall of the Shah of Iran in 1979 sparked off a second round of oil price increases by disrupting oil exports from the country. Suddenly the Oil shocks produced a virtual explosion of liquidity in the international banking system. The real interest rates on dollar dominated debt were negative-giving LDCs a strong incentive to incur huge debts The falling dollar also 'marked' the true debt-to-GDP and debt-to-export ratios as seen by the lending banks. It inflated the dollar value of both the exports and the GDP of LDCs to such an extent that the lenders failed to gauge the real magnitude of the external indebtedness of those borrowers. Consequently they indulged in carefree lending long after it was necessary to impose discretion. From 1971 to 1992, the total external debt of the LDCs grew by 600% in nominal terms, and debt service by 1100%. This great growth of indebtedness was further aggravated by the net doubling of the ratio of debt service to debt, owing to the shortening of maturities and the increase in nominal interest rates.

In the early eighties, the dollar value of the GDPs of the debtor countries contracted heavily owing to the abrupt recovery of the dollar. Accordingly, the ratios of (dollar) external debt (dollar) GDP and (dollar) value of exports increases. Also the nominal interest rates on short-term dollar assets sher up. As most of the dollar-denominated LDC debt was linked to the London Interbank offered Rate, the rise in dollar interest rate implied an equivalent rise in debt service. There was a decline in the dollar price of tradables implying an unsurge in the real burden of servicing foreign debt. The appreciation of the doller had, a stronger downward effect on the prices of homogeneous commodities than on those of manufactures, and the former ary very important exportables of most debtor countries. This led to a worsening in the terms of trade facing the debtor countries. Some other causes as outlined by Levitt are as follows :-

(i) The unprecedented velume of Euro dollar sovereign loans extended by several hundred commercial banks to

semi-industrialized LDCs, in the belief, shared by creditors and debtors alike, that the high rates of GDP and export-growth of the seventies were sustainable

(ii) *Banking innovations, including floating* rate of interest, cross default clauses, syndicated loans produced immense profits for the banks, while shifting exchange-rate and interest risk to the borrower.

(iii) The volte'-face made by the banks from mid 1982 onwards, as private creditors vied with each other to extricate themselves out of situations which had only recently appeared highly attractive, Capital flight became a crucial factor in debt accumulation in Latin America owing to over-valued exchange rates. It meant that the costs of stabilization were often inequitable distributed. The effluent shielded their wealth from devaluation and inflation by shifting assets abroad while the poor suffered as real wages declined.

When the debt crisis finally broke out the LDCs had managed to accumulate a total foreign debt of 600, 000 million dollars. In India, total debt servicing has tended to devour an increasing proportion of new debt contracted—up from 45% in 1980 through 74% in 1984 to 99% for 1986-88, Just for information' sake, here's stating a simple fact that India owes the 'world just about 70 billion dollars !!

Strategies for Dealing with the Debt Problem

There is increasing disagreement concerning the policies which should be pursued by the LDCs to decrease vulnerability to external shocks and achieve self-sustaining growth.

(I) Et Tu IMF ?

There is no evidence that the liberalization measures which regularly accompany programs negotiated with the IMF as a condition of access to structural adjustment loans—have contributed either to stability or to efficiency. As far as the Indian experience is concerned, we believe that such *policies have only resulted in economic* growth being linked to effective, elitist demand in the market rather than the satisfaction of the essential needs of the hoi polloi. As a matter of fact, conditionalities should not be exploited by the IMF, to impose arbitrary and ideologically based liberalization policies on countries with payment problems. Nor should targets with respect to domestic credit creation and fiscal reform be so tight as to produce 'over kill' in the form of compression of domestic demand with idle capacity, unemployment and forsaken

domestic savings. The IMF should abandon conditionalities pertaining to import liberalization in conditions of scarcity of foreign exchange. These otherwise encourage the import of luxury goods, result in the bankruptcy of domestic firms and increased unemployment, favour a shift from productive to distributional activity and place pressure on the exchange rate. In case a agricultural imports, there can serious effects of the capacity of the countries to feed themselves.

It is expected that the IMF and world band will overcome the 'confidence gap' which has emerged between private leaders and debtor countries in the aftermath of the balance—of—payments and ensuing liquidity crisis. It is also expected that the programs approved by the IMF—World Bank combine will have a catalytic effect on finance from the private sector and other parts of the public sector.

Recent observations reveal that the IMF is now exclusively engaged in short term crisis management in LDCs instead of suggesting long term structural adjustments to correct fundamental disequilibria. It has abandoned its original role and purpose, which was to provide stability to the system of international trade and payments and prevent competitive devaluations and to sustain the level of world economic activity by supplying medium-term finance to countries experiencing a temporary shortfall of foreign exchange. It has maintatined its facade of clinical sangfroid by not funding adequate investment strategies in export-oriented or import-substituting productive sectors. Also it's "quota entitlement limits" and the limits for assistance under the Compensatory Financing Facility has earned a lot of flak.

(II) Allowing The LDCs to work Themselves out of Debt

On a theoretical plane it is possible for a country to grow its way out of a dabt problem while continuing to have an expanding nominal debt. There should be a lowering of imports by structural adjustment of the debtor economy so that its industries can compete successfully with foreign industries in the domestic market. Also there should be encouragement of exports, not by making use of subsidies, but again by undertaking structural adjustments so that industries, by virture of becoming competitive, can squeeze into foreign markets.

However, in reality such a strategy has bombed. The capital has not been provided on the scale envisaged, and the countries have failed to grow much. Moreover it is not possible for a heavily indebted LDC to undertake structhral adjustments, which require new machinery. As a consequence, the debtors have received little new money, yet their indebtendebtedness relative to income has risen instead of falling.

(III) Debt-Equity Swaps Versus Direc-Confrontations

Krugman discusses two solutions to the debt problem. The first solution is the use of clever financial schemes to achieve voluntary debt-relief. Such schemes include buy-back of debt on the secondary market by the countries themselves, exchange of bebt for 'exit' bonds and exchanges of debt for equity. Each of these is intended to harness the existing discounts on secondary market transactions to the country's benefit. If a debtor-country pays the interest on its outstanding obligations, buying the loans at a discount can yield a good rate of return for the investor, plus or minus capital appreciation or depreciation. The market for such discounted loans is underpropped by the borrowers themselves : the greater the discount, the greater the debtor's incentive to use foreign currency to buy back its own debt and thus, in effect, to repay cheaply. However Krugman argues that such reserve financed buy-backs for countries "not no the wrong side of the debt-relief Laffer curve", owing to leakages, will hurt existing creditors, Debt-equity swaps, which in principle. Is a kind of securitization does not eliminate the debt problem as a whole, which consists, more fundamentally, in the worsening indebtedness of a wide range of ultimate borrowers. It does not end risk but merely transfers it from banks who cannot absorb losses to investors who can. Perhaps it is superfluous to add that, because governments do not make profits and so cannot have equity liabilities, debt/equity swaps are no answer to the public debt explosions in s DCS !

Krugman focusses on the second solution which deals with abrasive unilateral action on the part of the debtors. They should simultaneously pursue a policy of repudiating obligatons abroad while tightening belts at home. He says that the penalties against a country for declaring a moratorium on debt payment seem mild in comparison with the cost of making sustained net transfers to creditors of 5%. or more of GP each year. To us, krugmau's solution is not appealing because such across-the-board debt default would send the wrong signals : it would encourage debtors to seek ways to avoid their obligation. Ultimately, that would hurt the debtors by eliminating any prospects that they might resume borrowing from commercial banks, on a regular basis, at any time soon. After all, in economics, there is no such thing as a free lunch !!

Sachs adds a new twist to krugman's proposition by highlighting the power politics that underlines most debt crisis management procedures. He essets that the debt crisis is mainly a process of negotiation between debtor countries and creditor governments led by the united states. The

LDCS so far have continued to roll the stoue of sisyphus (inspite of experiencing hyper-inflation) because of their unwillingness to risk a foreign policy rapture with the US. Sachs argues that the US government can solve the crisis by declaring that it is no longer playing sugar daddy with the banks and that it recognizes the need for the commercial bank debts to be renegotiated on more favourable terms.

(IV) RE-SCHEDULINGS:-

The LDCS need new credits to prime their economics. commercial banks depend on debt servicing to remain solvent. Re-Scheduling i. e. rearrangement of the repayment terms of the original loan, is a last-resort device that can aecomodate the interests of both sides. It is a quid pro quo between the dedtor and the creditor. The dedtor receives a grace period before principal payments have to be made, the creditor receives a higher interest rate. Rescheduling stretches the maturity of debt, helps to benefit from a rise in world inflatious which reduces the present value of debt and enables to realize either a strong and sustained trade surplus or to close the deficit and secure a more stable long term capital inflow.

(v) OTHER STRATEGIES :

The LDCS should control the use of any inflow of scarce funds. They should check frittering away of large shares of funds to pay for import of luxuries, military military equipment, petroleum and real estates in foreign locales. Also the creditors must be persuaded to lend enough money to the debtors to keep them buying and to counter the deflationary preserves that will otherwise push them into depression.

Tarshis has made a propsal that involves the Central Bank of the creditor nation buying a portion of the commercial banks' debt and crediting the commercial Banks' reserves. Of course, any fear of exessive increaeses in money supply can be sterilized. But his proposal would have immediate fiscal effects unless the LDC- debt sold to the Central Bank at its true market value, which would immediately crystallize the loss of commercial banks and makes them unwilling to participate. Assuming that the Central Bank purchases at a book value in excess of market value, it would then face an accounting loss. The bank losses would then have to be mede good by the helpless taxpayers !

EXTERNAL DEBI SERVICE : A FISCAL ISSUE

This brings us to sjaastad's contention that it is this fiscal aspect that lies at the heart of the debt problem The crisis had been exacerbated by the fact that, in many debtor countries, the external debt was

incurred to finance a fiscal rather than a current account deficit. When across to foreign capital was denied, the debtor countries had to find domestic sources not only to finance their fiscal deficits but also to service their external debt. Countries such as Argentina and Brazil refused to face the requisite fiscal reforms and turned more and more to inflation as source of revenue. With modest exceptions, there has been ample expost justification for the initial Skepticism about the willingness and ability of the debtor governments to make the necessary fiscal adjustments. An important 'target' established by the IMF for a number of debtor countries is a laage trade account surplus. To achieve this target, substantial reductions in expenditures relative to output are required. The magnitude of those rebuctions is however influenced by the ratio of net to gross external debt, and its internal composition by the ratio of public sector to total external debt. If the income from foreign investments could be credited against interest due on foreign debt, only the interest on net debt would have to be "financed" by the balance of payments. In practice, because of exchange controls tax evasions, repatriation, of income generated from assets invesred abroad becomes difficult. The trade surpluses that are required to service the external debt gets magnified as a result.

THE EVIDENCE SO FAR: DOES SEEING IMpLIES BELIEVING ?

Sjaastad displays evidence of the resolution of the crisis by pointing out that the commereial banks have continued to lend to countries that obviously will neither repay nor service the new loans. This type of lending has permitted the banks to simultaneously provide a write-down of the debt while keepiog the debt service more or less current for purpose of bank regulation. By *rolling over existing loans as* they mature and *lending a substantial* portion of the interest, banks attempt to induce creditors ro make interest payments in full, thereby- forestalling the penalties of nonperformanc.* the delicate task of transformation of these de facto write-downs *into formal* agreements between debtors and creditors is what is required at present. We move into a game-theoritic framework where there occurs a perpetual power-struggle between and the debtors wanting to maximize it via threats, periodic "crises" and mutual histrionics. A deffnite outcome however remains a reeherche and is beyond the scope of this article.

EPILOGUE

'To use Keynes' words, the debt-service has become an 'annual tribute' consisting of a serious impediment to world trade and

income and threatening the international eeonomie order. It consumes time and attention of both donors and recipients in yearly reschedulsng exercises, which would better be directed to economic management of the countries: Stooped with colossal debt, steeped in ignominy and burdened with structural maladjustments that always cling like fleas to a mangy mongrel, a typical LDC lives under the Sword of amocles of that eve.-dangling "How". More attention is needed especilly to tho treatment of paris Club debt (longer rescheduling periods, more concessionality and write-offs). On the other hand, the interests of the nonproblem debtors should not be neglected . Policymakers in DCS will have to take co-ordinated actions to avoid fluctuations in the exchange and interest rates and to ensure that their macroeconomic management choices provide a suitable environment for global growth. Finally, it seems to us, that in the highly cut-throat and notoriously dizzy roulette of International Financing. management of the debt crisis will be the most crucial issue into the twenty -first century.

NOTES

1. Chichilnisky and Heal : The Evolving International Economy; Cambridge; 1986.
2. Keynes, J. M. : The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan; 1960.
3. Kettell and Magnus : The International Debt Game ; Graham and Trotman ; 1986.
4. Krugman, P. R. : "Developing Countries in the world Eeonomy" in Daedalus, Winter 1989.
5. Levitt, K. "Some reflections on the LDC Debt Crisis" in Hamouda, Rowley and Wolf (ed.) :

"The Future of the International Monetary Systems" Edward Elgar ; 1989.

6. Marer, P. : "Europe's debt situation in global perspectives : Utopian vs Realistic Solutions" in Singer and Sharma (ed.) : Growth and External Debt Management", Macmillan ; 1989
7. Sachs : J. D. : "New Approaches to the Latin American Debt Crisis", Paper presented at Harvard University Symposium on Debt Crisis : September 1988.
8. Sharma, S. : "External Debt Management and Economic Growth" in Singer et. dl. (ed.), (Op. cit) : 1989.
9. Sjaastad, L. A. : "The Making of the Debt Crisis and its Consequences" in Economie Impact : 1989.
10. Sorsa, P. "The External Debt Situattion of the LLDC" in "Intereconomics" January/February : 1991.
11. Tarshis, L. "A return visit to the International Debt problem of the LDCS" in Hamouda ; et. al. (ed.) (op. cit) ; 1989.

BY : TATHAGATA CHATTERJEE

Passion of The Brush

In 1896, a precocious 15 year old took the entrance examination for admission to the Barcelona School of Fine Arts. The boy was applying for admission to an advanced class actually meant for more mature students than him. For this examination, he was required to produce two charcoal drawings of a living model. The time that he was given for this was one month. The boy completed the task Within a week with a degree of assurance which borderded on contempt. The feet were left unfinished as though he could not be troubled by such details for an admission test. Seeing the drawings, an awed jury immediatelly admited him to the school. Both the drawing are still in the school archivas. The boys name was Pablo Picasso. As Picasso's friend and poet-thinker Jaume Sabarte's would write : "Picasso was in a hurry, in a far greater hurry than the members of the examining board, in a far greater hury than any of us··· It is as thought he were saying that his time was much more important than that of examining board."

Born on October 25, 1881, Picesso learnt to convey his wishes by drawing even before he could speak. One of the first words that he spoke was "piz", his baby version of "lapiz", a pencil. His precocious talent matured astonishingly early and his draughts manship and natural abilities are evident in works like "Girl with Bare Feet" which was done when he was only 14. Al though he was so sensationally admitted into the Barcelona School of Fine Art and subsequently to the Royal Academy of San Fernando in Madrid, he soon tired of their academic training. What endlessly fascinated him was the bustling life of the city. As a result he began to produce drawings of scenes of cafes, of street entertainors, of the poor and the destitute. In search of a distinctive personal style, he soon joined the artistic revolution brewing in, paris since the 1870's, when the Impressionists were making their innovative presence felt. He was also deeply influenced by the expressive styles of painters like Toulouse-Lantrec, Van Gogh and Gauguin. Picasso had left home for paris when he was only 19. Though he returned to Barcelona three times during, the next few years, it was clear that paris was to be his real home.

On the night of February 17, 1901, in the

back room of a paris wine shop, Picasso's friend, Carles 'Casagemas shot himself. Plagued by poverty and shocked by the suicide, Picasso was driven into despair. His paintings of this period, called "The Blue period" and lasting till 1904, reflect his mood of the time. The cold, melancholic, predominantly blue tones of the paintings emphasize the emotional isolation of the figures within their impersonal surroundings. The figures, distorted by the elongation and emaciation of the body, were drawn from the outcasts of Paris society. *In a review of Picasso's work of this period*, the critic Charles Morice remarked upon "the sadness ··which pervades all the work of this very young man." The Blue period vindicates Picasso's own statement that art is is the "daughter of sadness and pain."

In 1904—1905, Picasso's life and art changed dramatically. He fell in love for the first time and with this brightening of his mood, the tone of his paintings became less austere. The predominantly blue tone were replaced by roseate hues which suffused the figures in a softer and and happier atmosphere. His favourite subjects were acrobats and dancers, particularly the figure of the harleguin. In the paintings of this period, called 'The Rose Period', there is in Picasso a a new tenderness and empathy for his subjects. Charles Morice paid tribute to this new deepened sensibility by saying : "premature depression [in picasso] ···is succeeded by benefecient anomaly, aray of light : it is the dawn of pity that comes—it is hope."

During the following few years. Picasso's interest in Negro and Iberian sculpture led him along a different path and made him concentrate on the analysis and simplification of form. All this resulted in the painting "Les Demoieilles "Avignon" which is now seen by critics as the most important single landmark in the development of contemporary painting and as the herald of Cubism. The painting depicts "five horrifying women, prostitutes who repel rather than attract and whose faces are primitive masks that challenge ...humanity itself." In his grotesque, fragmented portrayal of the group, Picasso defied every anatomical principle. He also demolished perspective and violated long standing canons of painting. Picasso had intended and wrought a revolution. Georges Braque, who later became Picasso's co-pioneer in Cubism, put it best : "It made me feel as if someome was drinking gasoline and spitting fire."

Subsequently, Picasso worked with Braque and then with Juan Gis for the development of Cubism. This is probably the most influential aesthetie movement of the 20th century. One of its most important outcomes is the establishment of the idea that work of art exists for its own sake and in itsilf and not as reflection of reality outside itself.

From the latter part of the 1920's Picasso became increasingly preoccupied with the themes of anguish and despair and this lent his works a note of grim foreboding. He was concerned with the mythological image of the Minotour and the images of the Dying Horse and the Weeping Woman and his paintings reflected tortured renderings of violence, agony and death. In July 1936, a bloody and bitter Civil War broke out in Spain. In April, 1937 came the savage bombing of the Basque capital Guernica. Horror struck by this destruction, Picasso unleashed his creative frenzy in his second pivotal painting "Guernica" for the spanish Pavilion at the Paris world's Fair.

The massive 25 feet by 11 feet canvas is Picasso's 'magnum opus', the distillation of forty years of his art. In a sombre colour scheme of black, white and grey, anguished women, dead children and the screaming horse are all confined within a room from which there is no escape. Above them all is the 'bublimpassive, dispassionate, a symbol, in Picasso's own words, of 'brutality and darkness.'' The effect was overwhelming. The novelist Claude Roy called it "a message from another planet." But Herbert Reed's comment perhaps sums up most effectively the message of "Guernica". "(For art to be monumental) the age must have a sense of glory. In the modern world···the only logical momment be (one/to disillusion, to despair, to destruction. Picasso's great frasco is a monument to destruction, a cry of outrage and horror amplified by the spirit of genius."

Whatever else Picasso might have done for the rest of his life he will always be remembered as the creator of "Guernica". However, it is also true that his later work lacked the revolutionary qualities of his earlier periods. Neither was it at the root of new artistic movements like Abstract Expressionism, Op and Pop Art. Rather, he continued to evolve from within himself, drawng his subjects from his personal life and above all, art itself. His productivity remained phenomenal. After world war II, he produced an unending stream of paintings, sculpture, lithographs and even potteries. A critic has estimated that during his career, Picasso created some 50,000 varied works.

Picasso was responsible for shaping the course of art history in this century. At the same time he represented a natural culmination to the art of his time. He took cubism as far as it could go, that is, to a polar oppoiste of Romantic emotionalism and impressionism. It has been said that. "One of Picasso" sdistinguishing qualities as an artist is that he has always remained in the present, that is continuously evolving as he worked : his cubism, for example, did not follow a fixed course and was not aimed towards some goal that

he, knew in advance. In his greatest period he did not move toward abstraction through cubism but toward a realization of form, of which cubism was only one expression."

Picasso was by far the most celebrated artist of the 20th century. This is probably primarily due to the fact that he was among artists the most potent symbol of our times. He was the most succesful in subverting realing reality and at the same time the most precise in depicting (it). "His art does not look before of after, but firmly rooted in the present. In the words of the Poet Octevio paz :"·····he was the representative painter of our time ·····A representation requires·····a conformity and above all a similarity. Picasso is our time, but his similarity stems precisely from his nonconformity, his negations and his dissonances."

By SOUMYA BHATTACHARYA

A WINTER—NIGHT'S RETROSPECTION

The Silent night beckons me
To the hollow of darkness where it lies
The shadows call on me
To past lives and pastimes,
As I muse over the past
On that silent, wintry hour
Snowflakes outside
Settling on the night.
was vivid in me,
The album of my memory
As I thought of loved ones
On that silent, wintry hour
Thoughts·····thoughts of a child's world
Those dreamy, fantasy hours,
The world that now seems
To be the world that never was
Will it ever come to me
That dreamy. fantasy life,
And shall I wait for it
On that silent, wintry hour ?

Subhadeep Ghose
Sociology (Hons)
2nd yr.

Kiran Sankar Roy : Some Centenary Reflections

The country is supposed to celebrate this year the birth centenary of Kiran Sankar Roy, one of the foremost political stalwarts of Bengal politics in the colonial era. But posterity has meanwhile managed to relegate Roy into what we can call oblivion and obscurity ; his birth-centenary does not evoke much of an enthusiasm even among the senior Congress politicians today, not to speak of the present generation of young people, not quite initiated into the history and politics of pre-independent Bengal. Nothing much was exactly done by the establishment to perpetuate Roy's memory except naming a street after him or puttingup a portrait at the Writers perhaps a matter of formality. Roy has yet to find, it appears, his rightful place in the history of Bengal's pre-independent politics and post-independent administration. Unfortunately misgivings still persist in many minds about his role in Bengal politics in the pre-independent period. It would not be unfair to suggest that a certain bias has persistently worked against K. S. Roy because of his role in Gandhi-Bose confrontation and in the abortive United Bengal movement. The fact is that the then right Congress establishment at the centre could not fully swallow this provincial leader, who preferred to be independent-minded on occasions, never trying to cultivate consequential Congressites. Roy chose to be rather a loner, a political player primarily on his own terms. The centrists in the Congress as well as the left radicals in the party could never excuse him for his falling out with Subhas Bose and his faction in Bengal Congress politics. People of the then extreme left again dubbed him as a communist-baiter, pure and simple. The leftists of the time regarded Roy as nothing better than a status-quoist, a vain if cliquish bourgeoise leader, one of the usual breed in colonial India. To be sure, Roy had few takers. It appears that people of any political persuasion would never own him up and try to sell him. On the other hand Roy is summarily dismissed by some political chroniclers of the present generation as one of those political manipulators, doing the

bidding of the then Congress establishment. In point of fact however Roy could hardly persuade himself, as a constitutionalist by temperament to go against the norms and decisions of the party he belonged to. The fact cannot be denied that Roy was one of those unfortunate victims of a section of the nationalist media of the day and a target of the captive public of the volatile and passionate politics of Bengal.

Though Roy was social by nature and aristocratic by demeanour, he couldn't rub shoulders with the common run. As a person he was ofcourse, it should be conceded, a little unobtrusive, if secretive. To be sure he kept his options close to his chest and couldn't bring himself to play to the gallery for the sake of sheer populism. Roy was not easily accessible to one and all and in those days of agitational mass politics this probably worked to alienate him from the rank and file. He had to pay dearly for this,even at the cost of being misunderstood.

It is a pity that Roy remains practically unassessed as yet. Not a single comprehensive and dependable biography of Roy could be chanced upon. We have therefore to make do, at best, with press clippings of his period, Assembly proceedings, contemporary A.I.C.C. files, cross-references in political memoirs of the period and a few obituary notices.

Kiran Sankar Roy was born at a critical juncture in the political history of dependent India, in the year 1891. He was born in a reputed feudal family, noted for its culture and education in the Teota village of Manikgunje sub-division in the district of Dacca.

His fathes Hara Sankar Roy (Chowdhury) was formally educated in the sciences and law, he never practised though, and was one of the early graduates of The Presidency College. Kiran Sankar completed his early education at the Teota Academy and was later admitted to Hindu School. After taking his Entrance Examination Roy was inducted into the St. Xavier's College from where he sat for his F.A. examination. During his college days he became intimately associated with some of the revolutionary fire-brands of Bengal.

His parents growing apprehensive, lost no time in sending him to England (in October 1909). Roy found his berth at New College, Oxford and read with such illustrious persons like Harold Laski. Here he sat down at the feet of H.A.L. Fisher, the celebrated Professor of History, drinking deep of his learning. He found himself during his days at Oxford in the thick of cultural activities and played a crucial role in revivs ing the Oxford Majlis. As secretary of the Majlis, Roy organised meetings one of which was graced by the presence of Rabindranath

himself. Here in England he met Gandhiji with whom he sailed back to India after taking his B.A. degree in history. Incidentally he obtained the Blue Ribbon for his English composition.

Coming back to Calcutta Roy got married. He taught at The Presidency College for a short stint and at Sanskrit College for an even shorter one as a professor of history.

Round about this time he came to be associated with the Sabuj Patra literary circle and started contributing literary pieces in such journals as "Sabuj Patra", "Prabashi", "Nabashkti" etc. Some of his short stories were subsequently published in the form of a collection entitled "Saptaparna". His literary endeavours earned him wide acclaim among the readers. He happended to chair the Reception Committee at a local literary conference as well.

In 1919 he again sailed for England to complete his studies as a barrister. His second sojourn in England was significant because at this time Subhas Chandra Bose was very much there and both became great friends. Also both decided to discard Government service and to devote themselves wholeheartedly to the nationalist movement in India. Both returned to India in the same ship and joined the non-cooperation movement under the leadership of Deshbandhu C.R. Das. Roy was arrested in early 1922 and after his release from the jail, he was appointed by Das as a professor of History and English and the Vice-Principal of the Calcutta Vidyapith ; concurrently he had to serve as secretary of the Gouriya Sarbavidyatan. Roy put in his best here as a teacher and came into contact with a large number of young patriotic cultivated minds. Roy became the secretary of the newly setup Swarajya Party of C.R. Das. As secretary he demonstrated a great deal of organising skill and political foresight, both imbibed from his political mentor. He continued to work as the secretary of the Congress party in the Bengal Legislative Council for several years at a stretch with great competence. When Roy was simultaneously secretary of the B.P.C.C. he rendered unstinted support to Subhas Chandra who happened to be the President. In 1930 he relinquished his member ship of the Assembly at the direction of the party, along with others, In 1930 Roy was arrested in connection with the civil disobedience movement and suffered imprisonment for a year. Roy got himself elected to the Bengal Legislative Assembly from Dacca in 1937. He was however taken in as the leader of the opposition party in the legislature in 1940. It is a pity that both the Congress organisation and the Congress Legislative Party in the province were polarised, consequent upon the Bose group and the official Congress group falling out

with each other over differences of outlook regarding the execution of the Congress programme. Roy followed as a disciplined soldier the directions of the party. As secretary of the B. P. C. C. and of the Congress Legislative Party, as the leader of the parliamentary opposition and as a member of the A. I. C. C. Roy proved his metal by dint of his honesty and self-respect, tact and zeal. Roy vehemently condemned the communalists of the province running roughshod over the people in alliance with the police and the businessmen in the early months of 1946. When the partition of India seemed to be imminent, Roy made a fervent plea for a United Bengal. But this did not receive the blessings of the Congress highcommand. After partition Roy chose to settle in East Bengal to befriend the people and became a member of both the East Pakistan Assembly and the Pakistan Constituent Assembly, becoming the leader of the opposition in both.

In 1948 Roy had to accept the Home and Publicity portfolios at the behest of Dr. B. C. Roy with a great reluctance. In the autumn of 1948 Roy visited the Sundarbans to respond to the call of administrative duty and on return became suddenly ill. Eventually he breathed his last in the morning of 20th. February 1949, leaving behind a large number of admirers and not a few detractors.

It is interesting to note that in Kiran Sankar's diaries family matters and politics are given equal importance. He makes a trite mention of a consequential resolution of the B. P. C. C. in his diary and his acceptance of the home portfolio in the West Bengal cabinet receives only a casual reference. Nehru's visits to his place receive similar treatment and much is left out. This is so characteristic of the person who was used to making understatements like a typical English man and talked in undertones like a feudal. Roy was perhaps keenly aware of the fact that he was a controversial figure in Bengal politics in the late thirties and early forties but he never cared to build bridges with the rank and file or even with his own political opponents. That way he was a political leader with a difference and though politics engaged most of his time after the twenties he did not cease to diversify his interests or live them down as his personality had different facets. Inspite of politics he remained a litterateur and aesthete. He could not be put into one basket so to say. As a Congressite he put his best into the Swarajya Party of C. R. Das, the Congress of the late twenties, and the adhoc Bengal Congress, fulfilling in his own inimicable way his assigned role. The media did play up a political confrontation of sorts between Bose and Roy and in the process the image of Roy did suffer to an extent. But the saving grace was that Roy chose to remain a background figure putting up perhaps consciously a low profile when

Bengal politics was hotting up a little. Crude expressions never came his way and he could not put forth much vigour in his political statements but as a crusader against communalism and the second partition of Bengal none was equal to Roy. Eg. in his diary of 1947 there is no other mention under 15 August but Lahore riot. Participating in the debate in the Bengal Legislative Assembly he noted with concern that the political leaders of Bengal had lost their grip on the situation in Bengal since the middle of 1946 and thereafter. He felt that concerted hooliganism was encouraged by the Bengal Government of the day and ridiculed police inaction in quelling communal disturbances and decried the "unusual tenderness of the police towards the goondas." Also he clubbed together with kindred political souls by making a vigorous plea for a United Bengal, a move which never received the sanction of the then Congress high command.

Before knowing what Roy was it is pertinent to ascertain what he was not. Roy a waster out and out was by no means an energist in politics. He was anything but a populist or a demagogue. Roy was much too subtle, if not illusive. He was an individualist to a fault and would not utter a single word for sheer mass consumption. To be sure Roy was no mass leader, far less a charismatic mass leader. It was simply beyond him to brush shoulders with commonality for he was very exclusive for reasons of his varied accomplishments. Roy, lethargic as he was, never aspired for an all-India stature. He scrupulously avoided limelight and hardly played for the gallery. Roy, the elitist had in fact a real communication problem with the bread and butter people even as a mass mobiliser. He was not quite an agitator again, a fire-eating orator, a professional fighter or even a mass arouser of the conventional variety. Frankly Roy was reluctant to enlist any help with the use of his political clout from the high command for the furtherance of his own personal ends even though all important Congress leaders excepting Gandhi often visited his ancestral house in European Asylum Lane. He remained deep down an intellectual, an aristocrat all his life ; distancing himself from his fellow-leaders or activists. A true political heir to Deshabandhu he had astuteness and flair for backroom manouvers. Roy could not however endear himself to all and sundry. Indeed he was held in some respectful awe by some of the fellow nationalists while others didn't get over a mild sense of hostility and misgiving with regard to the person who was so illusive, secretive if not enigmatic and a master of dissimulation. To fathom his depths was by no means an easy task for those who came in contact with Roy. He was discarded by the extreme left as an arch anti-communist ; by the left nationalists who

couldn't forgive his anti-Subhasism even to date ; by the right Congressites who didn't take kindly to Roy's move for United Bengal or for that matter his all individualistic posture in Bengal politics. History is over so cruel in regard to the select few. Roy was indeed heir to infamy and odium dogging him down to his grave. Indeed he is a difficult, if uncomfortable subject, to write on. It is difficult to salvage the real person from a number of contradictions he couldn't himself resolve. Teota and Oxford were the extremeties he revolved around and to Congressites he was an Oxonian and to the Oxonians he was a Congressite. A feudal with strong rural ties yet very much in the metropolitan limelight, a sensitive literary soul maturing into a statesman of the Western type Roy was certainly a very distinctive figure. In spirit Roy must have belonged to history, literature and teaching even though he opted for professional politics. In him the fine taste of a creative artist was blended with the foresight of a politician or statesman. Roy couldn't stoop to be an amateur in any field or walk of social life. Haranguing and casual jail-going so characteristic of the then moderate Bengali nationalist was never his cup of tea. The contemporary style of agitational politics left him cold ; and yet he was very much there responding to the demands of the times and the country. The obtuse and gross politics of turmoil and open bickerings offended the finer sensibilities in Roy. He breathed the very air of aristocracy and rectitude in all he said or wrote. True Roy not only missed his vocation but also his proper moment in politics. He went over to East Pakistan, the place of his birth, to remain by the side of his helpless friends and this was something becoming of a natural statesman. When attendant responsibilities were so to say thrust on him he quietly walked into leadership by virtue of his capabilities and maturity of judgement without caring much for the same. His advice and judgement the Bose brothers valued greatly. Roy was an unrepentant Gandhiite falling out with his political adversary and one time close friend Subhas Chandra Bose without any biting of conscience. Roy was a power behind C. R. Das, J. M. Sengupta and Bose ; never aspiring after a dominating position until it naturally came its way. He did not happily suffer from the intoxication of power or preferment. For more than a quarter of a century Roy moulded and shaped Bengal politics without trying to lead it in a brash way and this ought to be attributed to his deep sense of self-abnegation. Roy to be sure was not a visionary or a titan. On point of fact he was more conscious of his limitations than anybody else ; he was never wanting in some sort of a self approval. A genuine and steadfast nationalist and anti-imperialist, secular and democratic by temperament he emer-

ged out of the nationalist, struggle with clean hands. He knew his rightful place in politics ; never was he given to a sense of self abasement or vaulting ambition. For instance Roy could never become a Mayor, a B. P. C. C. President, a Chief Minister even though he was helpful in making some of his friends achieve some of these positions. It cannot be denied that he decided to give up all material prospects of life. unusal for a true born aristocrat in those days, for the sake of his country. As a group boss or manager in Bengal politics Roy quietly played the game, not without tact and foresight and caring to see that it didn't offend others. In fact his urbanity of manners, incisive sense of realism and balanced judgement might all serve as explanations as to why he was regarded as a force to reckon within Bengal politics. He gave up his teaching assignment and legal practice but his penchant for literature and history remained all his life.

His was a life consigned to frustration for he must have chosen the wrong corridor in life. However much his endeavour and achievements have been played down succesively Roy brought into politics a certain culture and poise. The fact is that he refused to compromise to what he felt is wrong. In personal life as well he was so full of human qualities and his keen sense of humour never left him and many looked upon him as a guide and counsellor in public affairs and private life. As a good samaritan he always agreed to differ. He was honourable, if not magnanimous. His honesty of purpose and integrity of character were unimpeachable. His souud judgement, keen perception of men and things and a clear grasp of the difficult problem of politics were qualities for which he earned the respect of his friends and foes alike. If a reassessment of Roy is therefore called for, the time is now.

By : Prof. ASHOKE MUSTAFI

The 21st Century : USA as the Hegemon ?

"For the foreseeable future, no other nation or group of nations will step forward to assume leadership. And as the 20th century gives way to the 21st, the American Republic will continue to represent mankind's last, best hope···"

" We saved Europe, cured polio, went to the moon and lit the world with our culture. Now we are on the verge of a new century, and what country's name will it bear ? I say it will be another American Century."

—George Bush

The cold war is over, and everyone knows who the winner is. The command economy has lost its battle against the market economy and as a consequence the Russian bear is weak and hungry, 'socialism and 'communism' are bad words in Eastern Europe, Leningrad is becoming St. Petersburg once again, Warsaw Pact is no more, USSR is no more a socialist country, Mikhail Gorbachev is desperately hoping that the top seven capitalist countries will give him enough money to tide over his problems, governments all over the world are on a privatising spree. The 'spectre of communism' for better or for worse, no more looms over the world. History surely has taken an irreversible turn away from command economys. Facts speak for themselves.

At a narrower level this victory is very clearly the victory of USA. If the cold war was just a battle between USA and USSR, then surely USA has won. And as USSR continues to fight its inherent internal inconsistencies, USA clearly has emerged as the only Great Power in the contemporary world, and George Bush is thinking of a New World Order (though no one is sure what it is) and the world is preparing itself for an uniporal world. And when Saddam Hussain gave the opportunity to show its military prowess, the White House seized it with both hands. The spectacular show of destructiveness left no one unimpressed. George Bush's speech, cited above, therefore, quite predictably, smells of euphoria. To many of us, 1991 is the high water mark of Pax Americana.

Then why did David Calleo, Professor at the John Hopkins School of Advanced International Studies, describe USA as a hegemon in decay, set on a course that points to an ignonimous end ? To understand that we will have to go beyond the level of newspaper headlines and examine certain deeper, impersonal forces that work over a long period of time. In this essay I will try to do just

that and also ponder over certain other related questions.[1] The analysis is by no means an original one, but merely a synthesis of other people's works. If this essay helps people who are not serious students of history in understanding the contemporary world to some extent then my purpose will be served.

Though generalisation is a risky business, because there is always the possibility of simplification, yet, certain generalisations regarding the development, existence and decline of a superpower are widely accepted by the pundits of superpower study. These generalisations are true for most superpowers (including Rome) of the past, and is certainly valid for all superpowers in the last five hundred years, and therefore, quite obviously for USA as well. A proper understanding of these generalisations is necessary to understand the problems USA is facing today.

Firstly, we can notice an organic link between the shift over time in the economic balance of the world and the shift in power balances in the international world. For example, since the sixteenth century we notice a shift in the balance of economic power from the Mediterranian to the Atlantic and north western Europe, and again away from north western Europe towards USA since 1890's. The balance of political power has also followed the same course. In otherwords, military or political might has always followed from economic might—a truism that should not surprise anybody.

Secondly, and again not very surprisingly we find a link between an individual super power's economic rise and fall and its rise and fall as a political superpower. It is because economic resources are necessary to support a large scale military establishment. But this generalisation requires three important qualifications. Firstly, the generalisation is valid only in the long run, in the short run we may find a country very rich but not very powerful politically and alternatively on the decline economically but still very powerful militarily. Secondly, when we think of an economic decline we must think in terms of a relative economic decline, i. e. if a country remains as rich as it was while others around her becomes richer, we will say that the country is on a decline though in absolute terms, it is not. For example, Netherlands in the mid 18th century was richer than it was hundred years earlier but not relatively as France and England had become richer at a faster rate than Netherlands. Hence, Netherlands became a smaller power in the mid 18th century than she was a hundred years ago. And thirdly, economic rise and fall and political rise and fall do not occur parallelly. There is usually a lag time between the trajectory of a state's relative economic strength and the trajectory of its military/political influence. The reason

is not difficult to grasp. As a country's economy is expanding, she may prefer to get richer than spend the money on armaments. After some time, say fifty years, priorities may change. The earlier economic expansion may bring in overseas obligations like dependence upon foreign markets and raw materials, military allianees, colonies and military bases. At the same time other economic rivals may expand at a faster rate, and consequently might aspire to extend their influences abroad. Under such conditions an economic superpower may decide to spend more on armaments when it is relatively on the decline economically. For example, Imperial Spain spent more money on defence in 1630 than in the 1580's when it was richer and Great Britain spent more for ships and canons in 1910 than in 1865. It is seen that superpowers in relative decline almost always respond by spending more on potential defence (or security) and thereby divert resources from investment and aggravate their long term dilemma.

The above generalisations may make one believe that economics is the sole determining factor of the rise and fall of a superpower. It is not, especially in the short run. Geography, internal politics, cultural ethos and luck do play important roles. It is nonetheless beyond any doubt that the power position of a country has a clear connection with its relative economic position. Men do make their own history but they make it within a historical circumstance which can restrict as well as open up possibilities.

Keeping these generalisations in the background, we can now move on to the realm of specificity. In other words we can now begin our analysis of USA today. The reader has probably already anticipated the line that we are going to follow—firstly we examine whether USA is in a relative economic decline or not, secondly, if so, who is on the rise, thirdly, the implications of such a change in economic balance; fourthly, the policy open before USA and finally, whether USA is following the prescription or not.

The White House, surely, fondly recalls the glorious position the USA held in 1945. Stimulated by the vast surge in war expenditures, the country's GNP measured in constant 1939 dollars rose from 88·6 billion (1939) to 145 billion (1945). At last the slack in the economy which came in the 1930's was over. During the years 1940-44 industrial production rose by 15% per year, the highest ever. USA was the only country which grew richer because of the war. In 1945, Washington had almost $\frac{2}{3}$ of the total gold reserve of the world, more than half the total manufacturing production of the world took place in USA, it supplied $\frac{1}{3}$ of

total world exports and ½ of the total number of ships in the world. In conventional weapons it was second to none, in atomic weapons there was no second after it. Yet, altough this supremacy was unprecedented, it was also to quote Paul Kennedy, 'artificial'. This was because other Europeon powers and the rest of the world was abnormally low because of the war. In course of the next five decades we saw them developing at a faster rate than USA. America did not produce less, but others were producing much more, hence the relative decline. In 1960 USA's share of world GNP was 25·9%. In 1980 it was lowered to 21·5%.

Infact, even in the heady years of Pax Americana, its competitive position was already being eroded by a disturbingly low average annual rate of growth of output per capita, as compared with countries of Europe—

Average Annual Rate of Growth of Output per capita 1913—62

	1913-50	1948-62
USA	1·7	1·6
UK	1·3	2·4
France	0·7	3·4
Germany/FRG	0·4	6·8
Italy	0·6	5·6

According to Michael Balfour, before 1950 USA increased its output faster than others because it had been a major innovator in methods of standardisation and mass production, therefore its possibility of producing at a higher rate after 1950 was low. True, but not wholly. We must also notice certain other regressive forces—fiscal and taxation policies encouraged consumption, and hence low rate of savings, sinking investment in Research Development, and increasing defence expenditures.

These regressive forces went largely unnoticed in 50's and the 60's due to the glamourous developments in high technology (especially in air and space). exhibisionistic consumerism and by the evident flow of dollors in the form of foreign aid.

From the 1960's, however, the picture started to change. Both Kennedy and Johnson were willing to increase military expenditure overseas. Both of them were committed to increases in domestic expenditure. Neither of them liked the political consequences of inflation. The result was year after year of federal government deficits, soaring prices and increasing American industrial uncompetitiveness—inturn leading to a larger balance of payments deficits and other problems. The world share of gold (non-comecon) in US reserve decreased from 68% in 1950 to 27% in 1973. Nixon administration found it had little choice but to end the dollar's link to gold in private markets, and then to float the dollar against other currencies.

In the 1970's, the higher than average inflation in the USA generally caused the dollar to weaken vis-a-vis the Yen and the Deutchmark, but oil shocks, political turbulance in various parts of the world and high American interest rates tended to push the dollar upwards by the early 1980's. However, the long term trends continued to be depressing, productivity growth continued to decrease, which in the Private Sector fell from 2·4% (65-72) to 1·6% (72—77) to 0·2% (77—82), the federal deficit continued to increase alarmingly. American manufacturers found it increasingly difficult in competing with imported automobiles, electrical goods, kitchenware and other commodities.

On the positive side, it can be said that USA did become and remained more prosperous than it was in the 1930's, it successfully contained Soviet expansionism, created an unified capitalist block, which ultimately won over the Soviet block. But, nonetheless, USA though not destroyed, yet is today no more the economic hegemon it was in 1945. Along with the economic problems, we must not forget the social problems that exist in the USA. I won't go into the details of the social problems as they are well known. The military problems will be discussed a little later.

We have seen that the USA is on the decline, now we shall try to see who is on the rise. The table given below will reveal, that before the collapse of the Soviet Union, in the 1980's the world was not bipolar but multipolar, and the collapse of the Soviet system does not mean that USA is the only major power in the world. This fact has to be borne in mind as we proceed further.

GNP per capita in 1980 (dollar)

USA	11,360
USSR	4,550
Japan	9,890
FRG	13,590
France	11,730
UK	7,920
Italy	6,480

It is evident that the living conditions in western Europe is not worse than in USA, and therefore, Europe need not be as submissive to USA in the 1990's and 2000's as it was in 1945. But more of it later. We do see western Europe as a prosperous zone today, but this prosperity is more the result of economic recovery than rise. Then who has risen ? Japan, most surely, but not just Japan.

Experts opine that one of the most important of the second half of the 20th century has been the rise of the Asian-Pacific region, and the rise is likely to continue, causing serious repurcussions in the power

balance of the world. This rising zone not only includes the powerhouse Japan but also the rapidly advancing China, not only Australia and New Zealand, but also the newly industrialised countries like South Korea, Taiwan, Hongkong and Singapore, and also the ASEAN countries like Indonesia, Malayasia, Thailand and Phillippines.

Economic growth of this part of the world was stimulated by a combination of several factors : a spectacular rise in industrial productivity by export-oriented societies leading to a greater increase in foreign trade, shipping and financial services ; a thrust towards the newer technologies as well as cheap labour intensive manufacture, and an immensely successful effort to improve agricultural output faster than population growth. Each success has interacted with the other, which produced a rate of growth much higher than either the western powers or the Comecon. In 1960, the combined GDP of the Asian-Pacific region was only 7.8% of world GDP, by 1982 it had doubled to 16.4% and is likely to control more than 20% of world GDP in the year 2000 and increase with the years. In 1960 American trade with the region was only 48% of its trade with Europe, by 1983, it had risen to 122%. The GNP record is more spectacular. The region already holds 43% of the world GNP, by the year 2000 it will hold atleast 50% of world GNP. We all have to agree with P. Drysdale when he says that 'the centre of world economic gravity is shifting rapidly towards Asia and Pacific, as the Pacific takes its place as one of the key centres of world economic power.'

No country of this region, except China, can be regarded as a military power. Most of them have so far preferred to get richer than 'stronger', but as we have noticed earlier in our generalisations, priorities may change in future. The case of Japan's shift towards militarisation requires some elaboration, as some people are already talking in terms of war between Japan and USA.

Japan has grown spectacularly since 1945, and yet many policymakers in Japan feel that the position at the top is quite vulnerable. Japan is entering a more matured phase and therefore, the growth rate is going to slow down. Moreover, policy makers are also afraid of a 'scissor effect'. One blade is rapid growth of other Asian-Pacific countries like South Korea and Singapore, which are offering the foreign buyers more alternatives. The second is the possibility of future protectionism by USA and Europe. People in USA are already talking about restricting the Japanese sale of goods and takeovers and imposing protectionism to support domestic industries. In 1986 the US trade deficit with Japan was already dollar 62 billion, and protectionism is indeed a strong possibility.

It is no doubt true that Japan is entering a more matured phase, and its growth will slow down, yet there are enough reasons to believe that it will still expand faster than any other country. Firstly, the cost of raw materials, especially oil has gone down, and Japan is able to save millions of dollars as a result. Secondly, although an increase in the value of Yen may reduce export but it will give a boost to domestic output which will neutralise the loss in exports, and will make the industries more competitive and keep inflation low. Thirdly, because it does not have a huge oil reserve, Japan has constantly endeavoured to economise energy consumption and today it leads the world in this. In the past decade alone Japan has reduced it dependencies on oil by 25%. Equally significant is the Japanese surge towards the field of high technology—computers, supercomputers, computer software, semiconductors, Nuclear power industry, aircrafts and very importantly, robots.

Five structural factors will continue to give Japan an edge over other countries, firstly, the pivotal role in planning the economic development played by MITI, secondly, the increasing amount of money which being allocated to Research and Development, thirdly, the very high level of national savings in Japan, the fourth is the ready domestic market that the Japanese manufacturers get, and finally the high quality of the Japanese labour force. As a result of such structural advantages Japan today is not just the strongest industrial power but also the largest creditor nation. And who is the largest debtor ? USA.

However, the fact still remains that Japan is not a military power. At present Japan spends only 1% of its budget for defence purposes. But if a situation arises when Japan will be required to militarise itself, it won't be a very difficult proposition. If Japan spends 3% of its budget on defence, it will become the third largest military power in the world. Given the technological infrastructure that Japan possesses, it can easily build carrier task forces for her navy and also long-range missiles as a deterrant. Moreover, in the modern world, the destructive potential of even the conventional weapons and the cost of warfare has become so high that a full scale war has become almost an impossibility. Therefore, political power in future may be held by those who are economically powerfull. Military strength may become a less important factor.

One consolation for the White House is that it is in a better position than USSR. It has fewer problems at home, it is still a major power in industry and technology in absolute terms and because of its freer society, it has a better chance of adjusting itself to

the changing circumstances. However, the relatively better position in comparison to USSR is not much of a consolation really. Though USA is at present still in a class of its own in economic and technological matters, yet, it has reached the position where it cannot afford to avoid the two great tests that every superpower has to face someday or the other. In the words of Paul Kennedy, the tests are 'whether···it can preserve a reasonable balance between the nation's perceived defence requirements and the means it possesses to maintain those commitments; and whether...it can preserve the technological and economic bases of its power from relative erosion in the face of ever shifting patterns of global production.' Like Spain around 1600 and Britain around 1900, USA today has inherited a large number of strategical commitments which were made during its sunshine years, and faces the risk of what is generally known as 'imperial overstretch.' Decision makers in Washington is gradually coming to realise that the sum total of the interests and obligations all over the world is much larger than the country's power to defend them all simultaneously.

What has increased the problem of USA is the possibility of a nuclear annihilation—a fact that according to many has changed the complexion of world politics. However because of the capability of the present nuclear stockpile of the world to destroy the planet many times over, the chance of a nuclear war is almost nil. Hence, more and more emphasis is being given to conventional weapons. However, in case of a non-nuclear war in the future, USA will face the dilemma that Spain and Britain had to face previously. In each case the number one superpower in decline faced threat not really to its own security (no one can even dream of conquering USA) but to the nation's interest abroad. In such a situation, because the interests are so widespread that it will be difficult to defend them all simultaneously, but at the same time it will be difficult to abandon any of them with out running further risks.

Each of those interests which USA has take care of now, were undertaken by the US government for what was the need of the time, and in most cases the reason for American presence (from the US point of view) has not diminished. Infact, American interests in the Middle East (where, according to some, Bush won the war but lost the peace) and in Eastern Europe has increased in recent years. The sum total of such global interests is mindboggling. It was perhaps necessary for the sake of comprehensiveness to go into the details of US policy problems all over the world in some detail, but in that case, the essay will become a book. The problems that USA faces in the highly sensitive middle

east, in latin America, in Central America, in Western Europe, in Eastern Europe & Russia, in the Pacific region, in the Indian subcontinent—problems which are so varied and so many—are in totality a policymaker's nightmare. In addition to the sheer geographical spread of the problem, there is the problem of growing resentment all over the world (except perhaps Eastern Europe) especially after the Gulf War. The collapse of Soviet Union and the prospect of unhindered aggressive imperialism has alienated the majority of the Third World. Morcover, resentment is growing in USA itself against US involvement abroad. Bush was lucky that war in the Gulf was won quickly, another Vietnam would have been too costly for him as well as Uncle Sam.

Historians agree that US war machine all over the world is overstretched (see map). It also bears an uncanny resemblance with the spread of the British war machine across the world in the 1900's. Therefore. USA today faces a fundamental dilemma : it has today the same (or greater) amount of obligations across the globe as it had a quarter of a century ago, when its share of World GNP, manufacturing production, military spending, and armed forces personnel were so much larger than they are now.

In 1985, USA had 520,000 armed personnel abroad, including 65,000 afloat. Yet, according to the experts, it was not enough! Although, defence expenditures were trebled since 1970, yet Luttwak, in his book 'Pentagon and the Art of War 'points out that the numerical size of the armed forces increased by only 5% Like Great Britain and France in the past, USA today is facing a painful reality—a nation with extensive overseas obligations will always have a more difficult manpower problem than a state which keeps its armed force solely for home-defence.

In addition to the problem of overstretch, USA also faces the problem of lack of efficiency of the military system. The Gulf war has improved the image of the U.S. military but has not solved its fundamental problems. A detailed discussion is again impossible, but we cannot ignore the problems of the war machine altogether. This is because in the modern world USA is number one on the basis of its military strength; economically it is no better than Japan.

Military analysts have pointed out that there exists a high degree of interservice rivalry in the U.S. military system. During peacetime, this can, be dismissed as an example of bureaucratic politics but in case of a war which may require an emergency despatch of Rapid Deployment Joint Task Force, in which all four services has to combine together, a lack of coordination can be fatal.

Moreover, Kaufman points out in his book

'Reasonable Defence' that large scale waste, fraud and abuse is commonplace in the system. We must not forget the various scandals that emerge from time to time over extraordinarily expensive and underperforming weapons. The reason can be found in the lack of proper competition in the military industry, the obsession with unnecessary high-tech weapons, and the striving for huge profits.

It is also pointed out by experts that in an attempt to match Russian 'quantity' with 'quality' weapons, USA became obsessed with high-cost high tech weapons, many of which were unnecessary. For example, in comparison to the Carter Administration, the Reagan Administration spent 75% more on new aircrafts but acquired only 9% more planes ! As a result of this tendency many experts doubt whether USA and its allies would have enough sophisticated aircrafts and tanks after the early stages of a ferociously fought war. If a third battle of the Atlantic occurs, it is doubtful whether US Navy would have enough submarines and frigates if heavy losses are incurred in the early stages. If not, then the mighty war machine will face problems because such high-technology weapons cannot be replaced very easily.

Such strategic dilemmas are accentuated by financial and policy problems. In the coming years USA will find it very difficult to increase the financial allocation for the defence as the budget deficit get larger and larger. If a halt or an actual cut in the financial allocation occurs then Pentagon will find it very difficult to procure the high-tech weapon systems whose, cost are going up at an amazing rate.

A second problem is the variety of policy problems that a superpower like USA has to face to day. Britain also had to face this problem of planning for war in north Afganisthan as well as Belgium. But the problems of Britain were insignificance in comparison to the problems of USA. If the most important issue before the US is the threat from USSR (Pentagon cannot rule out a military backlash if Gorbachev reforms fail) then money will have to be spent for nuclear weapons like the MX missile, the B-1 and 'stealth'bombers,Pershing II's. cruise missiles and Trident bearing submarines. If USSR on the other hands prefers indirect clash in the Third World then money will have to be spent for small arms, helicopters, light carriers etc. USA is not yet certain who will threat her more in future, if China and Japan becomes a powerful challenge then USA will have to think about possible combination of weapons against these countries, if the threat comes from a more coherent Middle East, combinations will have to be different. But what if the policy makers

given the sheer complexity and unpredictability of the future strategic scenario, make the wrong decisions ? Infact, analysts like Luttwak, Canby and Cohen doubt whether the present decision-making structure permits a framing of a grand strategy. To illustrate the point,attention may be drawn towards the very frequent public dispute about how and where the United States should employ its armed forces abroad to enhance its national interests—with the state Department wanting clear and firm responses made to those who threaten such interests, but the Defence Department being unwilling to get involved ovesreas except under special cases like the Gulf crisis. Moreover, Pentagon has also shown a penchant for taking unilateral decisions in the arms race with USSR (like the 'star war' programme and scrapping the SALT II) without consulting the allies. Such actions in future may cause split in the allience. There exists uncertainties regarding the role of the National Security Council and the individual security advisers. There has been inconsistencies in the Middle East policy as the policy makers are split into pro-Arab and pro-Israel factions. There has been interdepartmental disputes regarding the economic tools—boycott of trade or embargo on technology transfer or stopping foreign aid or stopping military assistance—to further US interests in the world. As a result one can notice inconsistencies in the policies towards the Third World, South Africa, EEC, Poland and USSR.

Therefore, we see that it is not without reason that the analysts doubt the capacity of USA to frame a coherent grand strategy or 'New World Order.' They have pointed out that 'a country needing to reformulate its grand strategy in the light of the larger uncontrollable changes taking place in the world affairs may not be well served by an electoral system which seem to paralyse foreign-policy decision-making every two years. It may not be helped by the extraordinary pressure applied by lobbyists, political action committees, and other interest groups all of which, by definition, are prejudiced in respect to this or that policy change ; nor by an inherent simplification of vital but complex international and strategic issues through a mass-media whose time and space for such things are limited, and whose raison d'etere is chiefly to make money and secure audiences, and only secondarily to inform. It may also not be helped by the still powerful 'escapist' urges in the American social culture. ···Finally, the country may not be helped by its division of constitutional and decison making powers' (P. Kennedy).

Such military, policy-making and structural problems are no doubt serious, but the more basic problem is the problem of the

malfunctioning of the US economy. We have already discussed relative economic decline of USA in comparison to the Asian-Pacific countries, now let us probe some of the fundamental problems of the economy itself. The relative industrial decline itself is no doubt the first major problem. The decline in the share of world production of traditional manufacture as well as high-technology poducts like computers and robots pose serious problems for the USA. In the first case, the gap in the wage scales between USA and the newly industrialised countries is alarmingly high, but failure in the second case will be even more dangerous. It has been estimated that US trade surplus in high tech goods has fallen from 27 billion dollar in 1980 to an amazing low of 4 billion in 1986 and is heading towards a deficit.

The second problem, and a less noticed one is the decline in agriculture. In the decade after the 1970, the EEC has emerged a major agricultural exporter, but more importantly many Third World Countries have become self-sufficient and even exporters of food crops. As a resulf USA's share in world exports has decreased alarmingly and many American farmers have found themselves out of business.

The third major problem in US economy is the chronic budgetary deficit. This was caused by the decline in US trade, but also because of such populist measures as not raising the taxes and also the military expenses during the Reagan years. As a result during the Regan tenure USA reached a situation where it could only-pay-off the debt by borrowing an ever larger amount of capital from abroad, thus becoming the largest creditor in a gap of few years only. In 1980 the US national bebt was 914.3 billion dollars and the interest on debt was 52.5 billion, by 1985 the debt had become 1,823. billion and interest due was 129 billion. And it is estimated that by the year 2000 the national debt will be 13 trillion and the interest due will be 1.5 trillion. It may be lowered down of course, but the overall trend is still quite depressing. The only parallel of such an acute financial crisis is probably France in 1780's which went a long way in ushering in the French Revolution.

There is, of course, no reason to believe that US economy is doomed for ever and very soon USA will be as poor as Ethiopia. Many economists are quite optimistic about a recovery and they have their reasons. Nevertheless, there is no doubt that America is no more the power it was in the 1950's, its economic base is not strong enough to support its military ambitions. And it is also showing the signs of panic and nervousness that Britain showed in its years of decline. We see today the same urge for 'renewal and

reorganis ation. A strong man never worries about his physical efficiency.

Thus, we find USA in a dilemma that confronts all superpower some day or the other, it's war machine and strategic commitments are spread all over the globe but its economic base is shrinking. Other countries are moving up faster and faster and USA cannot stop them. If USA spends more money in armaments it will lead to greater economic decline, but if its military budget is cut then it will diminish in military status, which will in turn diminish it's superpower status.

Therfore, we now arrive at the position where we will be able to answer the question we set out answer, and the answer of most experts is no. But that does mean, they point out, that the fate of USA will be bad as that of Spain or Netherlands on the Habsburg Empire. According to Evan Thomas, the first thing that USA must do is to avoid the temptation of changelessness. According to him, if the United States is goiog to avoid the fate of the Austro-Hungarian Empire, the nation surely will have to change and avoid the temptation of protectionist walls against foreign competition, of turning away foreign immigrants and making USA a closed society. For USA a much better policy will be to 'remember that in an open society change is the norm—and welcome it.' Evan is cautiously optimistic about the future of USA. One key characteristic feature of USA, according to him, is social mobility, 16th century Spain as well as 19th century Britain was socially immobile and hence, couldn't cope with the changing time. But in USA the ruling class is never static. 'Ruling elites surface, then are swept aside or overwhelmed by new money and new blood,' says Thomas. Paul Kennedy believes that 'the evolution of an effective overall American policy to meet the 21st century will be subjected to the greatest test' but does not rule out the possibility of USA avoiding the fate of Spain or Austro-Hungary and remaining one of the major powers in a multipolar world. He says that 'the decline is relative not absolute, and is therefore perfectly natural, and the only serious threat to the real interests of the United States can come from a failure to adjust sensibly to the newer world order.' Thomas agrees—'the future (of USA) is not predestined. It is a matter of choice.

Surely USA can readjust, recover and remain a major power in multipolar world but that doesn't mean that USA will just as India can become an economic superpower but may never become one. Is USA actually adjusting itself to the changing circumstances ? Is George Bush's New World Order an attempt at readjusting to the changed order of the world ? Or is it a nostalgic attempt

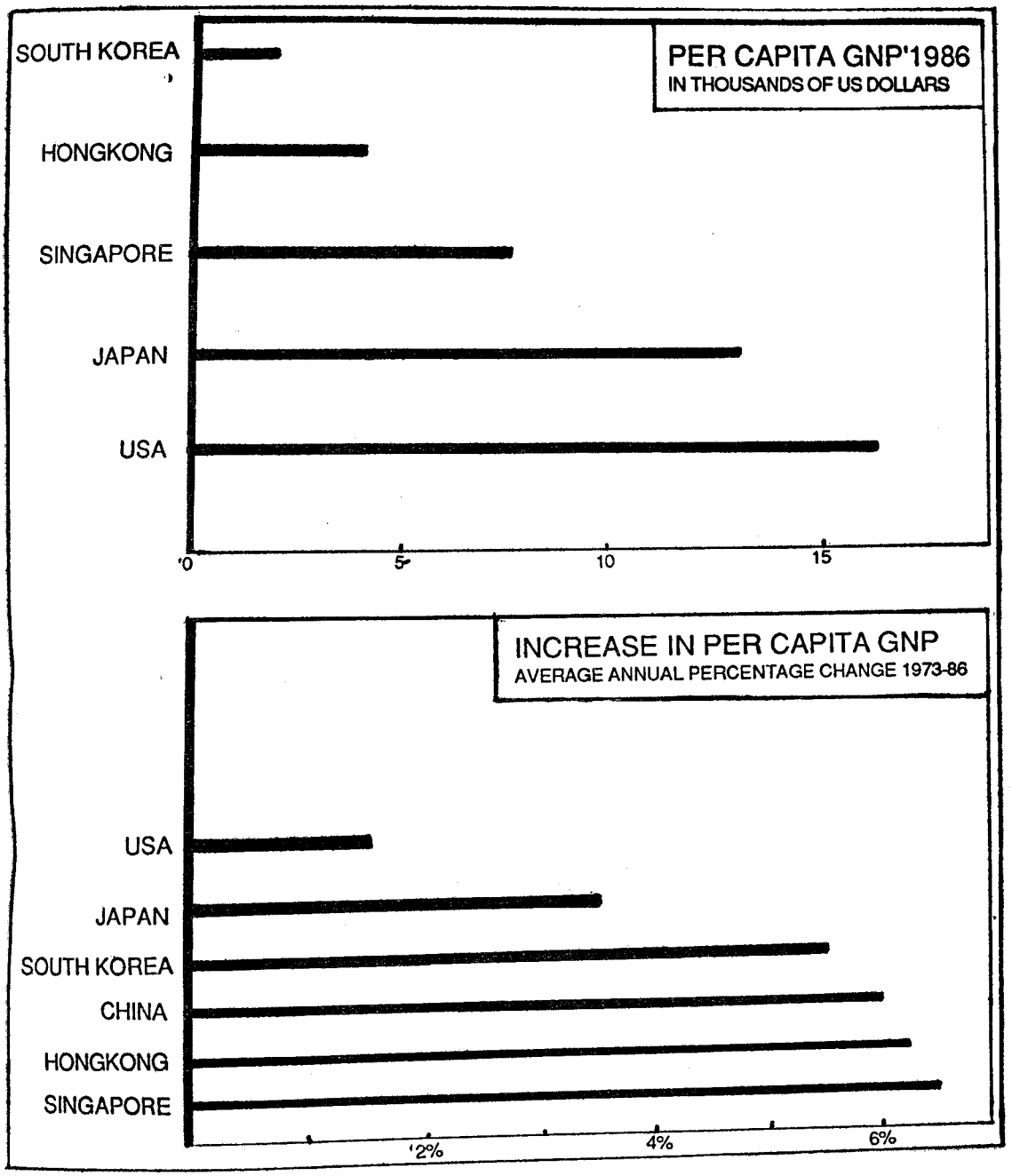

GROWTH

Although USA has a higher per capita GNP than any other country.
Japan is fast closing the gap
and NIC*S are scrambling behind.

* NIC—Newly Industrialised Countries.

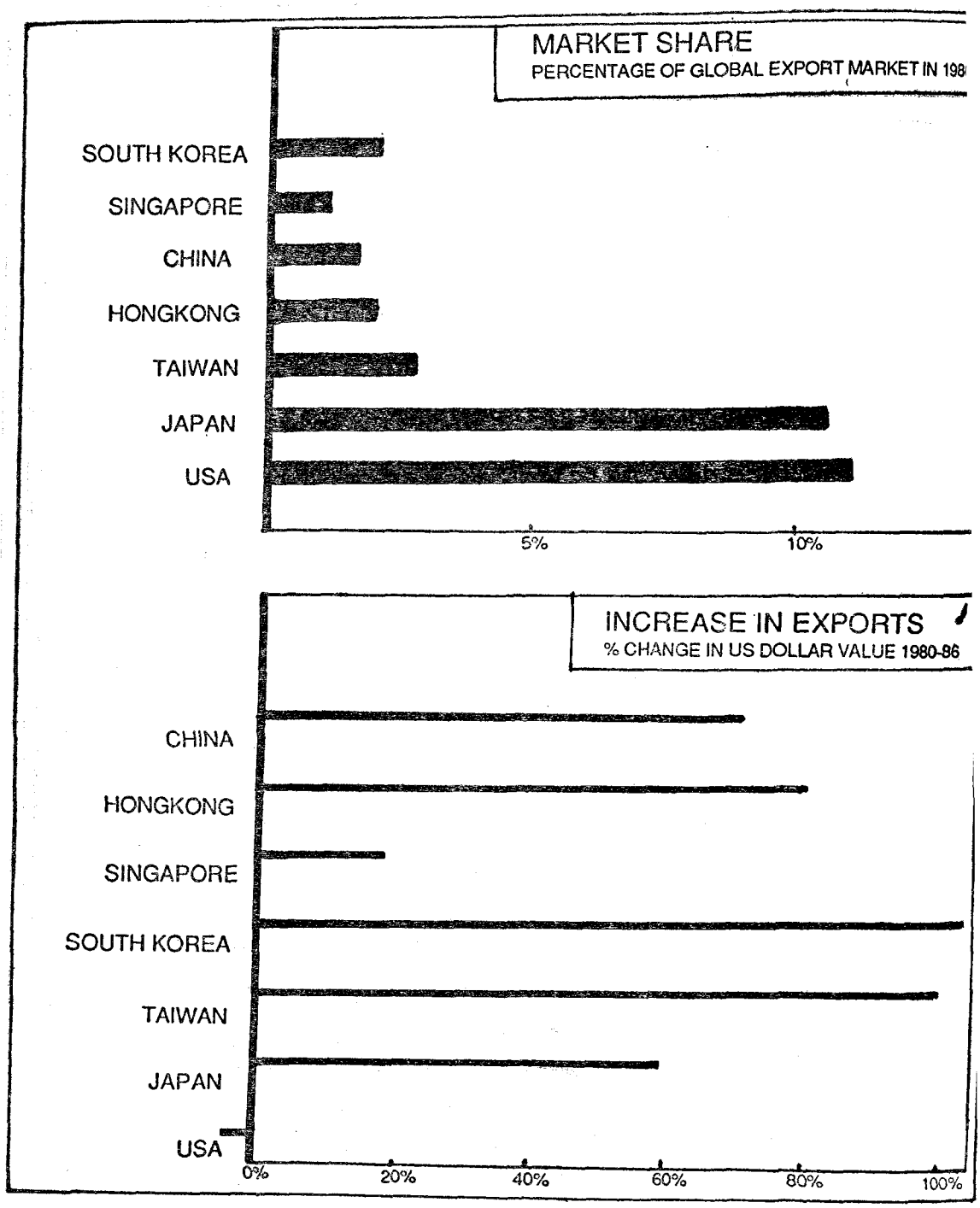

TRADE

In exports USA is Still in front, but its growth is negative and all the Asian Powers are Moving up rapidly

of ruling the world? No one, it seems, not even George Bush himself is quite sure. Lawrence Eagleberger, the US Deputy Secretary of State confesses, 'I can't describe to you what the new world order, ought to look like. Zbigniew Brezeinsky, former President Jimmy Carter's National Security Advisor says, 'I really don't know what it means.' Most third world countries fear of unhindered Pax Americana. But says Douglas Hurd, British Foreign Secretary, 'A Pax Americana or Pax Atlantica is simply unrealistic.' Adds Francois Mitterand, 'No one can claim that from now on one country decides for all.' Marta Dassu, Director of the Rome based Centre for Studies of International Politics is more cynical. Says she, 'the building of a new world order requires time and long term planning, but the timing of domestic politics in the U. S. is so quick that America doesn't have the patience for this sort of work. Michael Duffy pointed out in the January 1991 issue of Time that in domestic policies Bush is not trying to change but to maintain the status quo. Says he, 'at best he has tinkered at the margins of America's domestic ills. Rather than battle a national decline that some fear has already begun, Bush is trying only to manage it, and concludes, "it is a pattern that in the short term may get him reelected in 1992. It is not one that will, as Bush promised in his nomination speech of 1988, "build a better America."

USA still can avoid the fate of the fallen empires of the past, but in order to do so the sinking ship will require a better captain than a Ronald Reagan obsessed with 'Star Wars or a George Bush troubled by a 'vision thing'. With the passing each year,the stakes against USA are getting higher and higher.

By : DEBRAJ BHATTACHARYA

Asia Before Europe

[Review of K. N. Chowdhuri's Asia Before Europe (C. U. P. 1991)]

Asia has not been one geo-historical entity, so far studies in economy and society are concerned. Very often one comes across 'History of Europe' titles but it is only recently that history of Asia is being attempted to write. Professor Kirti N. Chaudhuri's book 'Asia Before Europe' is a commendable venture in this regard. This study of economy and civilisation in the Indian Ocean from the rise of Islam to 1750 A.D. is a sequel to his earlier studies on trade and other socio-economic issues of the Indian Ocean civilisations. While Fernand Braudel had penned the world of the Mediterranean, after paying a tribute to Braudel, Chaudhuri makes a similar attempt to recreate the world of the Indian Ocean where he is concerned with South Asia or the Indian subcontinent, China, South East Asia and West Asia. In the opening chapter, he discusses the problems of comparative history and talks about Leibnitz's concept of time and the spatial units of time. He identifies three sets of problems, namely, epistemology, broad history and theoretical difficulties. The discussion proceeds on to Godel's incomplete theorem and also takes note of the question of relativity and the issue of mental construct. It is exciting to know in the theme of deconstruction of Asia that the word or the concept emerged after excluding a number of sets, the first of which was Europe. The philosophical underpinnings in the word have been brought out in detail. He focuses on methodology and its application dry heavily drawing upon, Brandel, Foucault, Dantor's set theory and touching upon Russel's idea of time. He tries to develop the theoretical framework of space, time and structures in the Indian Ocean and goes on to talk about the comparative world views of Islam, India, South East Asia and China. This categorisation is liable to come under heavy criticism because of the in-built equation between West Asia and Islam.

In the following chapter, the discussion is on the structural integration and differentiation of comparative civilisations of Asia, where he argues that intuitive or conditioned awareness of a construct formed by religion, language, political obligations and rights, artistic traditions, and practices of everyday life helped people of pre-modern Asia to indentify their collective individual place in the economic or social space. 'From the high plains and eroded valleys of the eastern Mediterranean to the pineclad mountains of China and Japan, on the edge of the unnavigable pacific, argues Choudhuri, there existed visible and not-so-visible frontiers on the

cultural cartography of Asia. Contemporary awareness of comparative features can be discerned in the writings of the monarchs and the intellectuals. Alongwith that, there was popular perception among tourists and traders as well. Traders carried out economic activity which the state tried to influence at times. There were historical attempts at monetisation of Wang-An-shih in China and Muhammad Tughluq in Sultani India. Tughluq's token currency anticipated introduction of paper currency in China. Ala-ud-din Khalji's attempts at price regulation did not really benefit the poor but the state took an active role in the creation and expansion of market system. He also just mentions the opposing view of the economic system giving rise to the state can be put forward, but rightly criticizes the tendency to see monetisation and urbanisation at the same pace between 1000 and 1800 A.D. In the historical case studies of Grunebaum from the Yangtze Delta and Shiba from West Asia, one finds usage of indentical theoretical tools for analysing the structure of economic articulation between town and country. Three variable but interlinked flows of action, namely, movements in agrarian production, inter-regional trade and political control are discernible. The earlier thesis of rural units and bureaucratic states does not hold any longer.

That the battle of Plassey signified a revolution has been showed in 'The structure of time and history'. The acquisition of the treasury of the richest province (Bengal) of the then Indian subcontinent terminated the need to ship American treasure from Europe, Choudhuri has brilliantly exposed the combination of military technological innovations like cannon, gunpowder, stirrup and the basic social urges which created ground work of larger historical movements. They randomly interacted with each other in the long-run to give rise to four significant expansionary movements which rocked the shores of Indian Ocean between 630 A.D. to 1800 A.D. These were Islam, the Chinese civilisation, the migration of war-like nomads from central Asian pastures and the European maritime expansion. Remaining true to the Braudelian framework. the author cites examples of the long-term and the stationary. The treatment of cyclical time is excellent and the issue of war cycle is extremely pertinent. One can not but appreciate that the historian's mind is not being limited by the division of time. The reflective point that annual pilgrimage to Mecca belonged to cyclical class of events is also exciting to take note of. The treatise on the range of groups of people drinking tea and the culture of tea over the years in China is excellent. Along with such lively discussions, he also criticizes the rational

discourse of the late 18th and 19th centuries which placed European geography and Western civilisation at the centre of everything. But he himself uses the term middle-east to denote west Asia, thus not always being able to get out of Eurocentrism. The difference in perceptions of an European living in India with those remaining away have been brought out through an example. Similarly, difference can also be found in the varying images of desert among the settled communities and the nomads. In the first chapter on social identities, he establishes tripartite combinations and oppositions in food while putting forward a critique of Levi Strauss' binary oppositions like food and non-food or exogenous and endogenous. While discussing the structure of rural production, he argues against Malthusian theory of population and the principle of diminishing returns as well as against their combination which gave rise to the theory of oriental despotism. There was complexity in the administrative method of management of economy though there was stratification at several levels and hierarchy of centre, province and village.

In the discussion on the products of the human hand, Chaudhuri categorically shows that the Asian products were far superior and commercially more saleable in the European market from the sixteenth century onwards, only to be replaced in the nineteenth century. The complex relationship between the artisans and the dominant sections of the society is brought out. That the community of artisans had their own specific forms of expression is a pointer to the separate mental world of the 'subaltern', if one is permitted to use that much debated category. In the concluding chapter, the author talks about perpetual memory and the dynamic stages in Indian Ocean History. The final stage in the dynamic movements was reached during the second half of the eighteenth century when British military and naval power fused with European technological revolution redrew the civilisational map of the Indian Ocean.

Chaudhuri views Braudel's works as a statement of artistic creativity, but as things stand, he could not rise up to Braudel's standards. It is absolutely correct that 'History is not a series of photographic snapshots of reality' but, the author has not really been able to bring the royal touch of the historian as Bloch or Braudel could do. This shortcoming notwithstanding, the references to theories and developments in physical sciences, mathematics and philosophy are remarkable and so are exercises like that of learning from Dali's paintings. He has tried to establish a new

set in the study of economic history. The attempt to bring together Indian Ocean civilisations is commendable in view of the fact that intra-Asia exchange is very limited in social science disciplines. Colonial domination in thinking and epistemological imperialism are very much there. The struggle against these is still in infancy but possibilities of development are there. New paradigms are emerging in the study of history and social sciences. Interdisciplinary approach is welcome and has already established itself in quite a bigway. While a group of historians is trying to know 'more and more about less and less', the present attempt, if permitted to say, so far as the reader is concerned is knowing less···about more and more'. Eurocentrism is slowly giving way to a multipolar world in academic thinking and practice. But as Russell said in 'The ABC of Relativity', it was very difficult for a thinking mind who grew up in Newton's world of determinism to accept Einstein's world of relativism, in the same way, it would take decades if not centuries for the world to come out of Eurocentrism in academics. Chaudhuri's attempt is extremely welcome on this count though he, while writing comparative history, does not take Bloch's 'A Comparative History of European Societies' into account with that importance which Braudel or Foucault commands from him. Though heavily drawing upon European thought, the attempt to create a new set will be a feather in Chaudhuri's cap.

—**Sunandan Roy Choudhury**

পরিচিতি

প্রথম বর্ষ

অর্জুন সেন শর্মা—বাংলা বিভাগের ব্যতিক্রমী পুরুষ। প্রিয় পরিচিতি-তাত্ত্বিক। বিখ্যাত, দুর্বোধ্য বিন্যাসে বাংলা লেখেন বলে। চৈত্র্যের উষ্ণতা এড়িয়ে চলেন বলে দাবী। ক্যান্টিন থেকে পোর্টিকোয় যাতায়াত চোখে পড়ে বিমল শার্টে, রাবীন্দ্রিক পাঞ্জাবীতে, কখনও বা অমিতাভী প্রথায় পরা শালে।

তিতাস মিত্র—আসেন, যান। ঋত্বিকীয় ভঙ্গিমায়। চোখে পড়ে ঋত্বিকীয় বিরক্তির সজ্জিত বহিঃপ্রকাশ। স্বাতন্ত্রের সংস্কারে ভোগেন বলে সবাইকে পাত্তা দেন না। বাংলা।

প্রিয়াংকা চৌধুরী—পুরুষ সংসর্গ অপছন্দ করেন রহস্যময় কারণে। ফলতঃ তার কবিতায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব নেই। বিমূঢ় বামপন্থী। উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলা বিভাগের এই ছাত্রীটি নাট্যমোদী।

সুমন ভট্টাচার্য্য—জুনেই তার কাব্যচর্চার শুরু। যদিও তা অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ। পদচারণায় ব্যক্তিত্ব এবং আভিজাত্য ধরে রাখার চেষ্টায় সদাসতর্ক। জুন মাস কি শেষ হতে চলেছে? হোক, সুমন কিন্তু জুনিয়ার থাকতেই পছন্দ করে।

দ্বিতীয় বর্ষ

দেবরাজ ভট্টাচার্য্য—যুক্তিবাদী। মাঝে মধ্যে তার্কিক হিসাবেও দেখা যায়। প্রথা নিয়ে চিন্তিত, নারী সম্পর্কে উদাসীন। ভাবেন, ভাবান। মেপে হাসেন এবং সাবধান, হেসে মাপেন। ইতিহাস।

শুভদীপ ঘোষ—নারী অধ্যুষিত সমাজতত্ত্ব বিভাগে কোনঠাসা ভালোমানুষ। পছন্দ অপছন্দ মিলিয়ে এতটাই রহস্যময় যে প্রায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে আছেন বন্ধুমহলে। পিলে চমকানো টিশার্ট পরেন কখনো কখনো।

সুপ্রতিম সরকার—কথা কম, কাজ বেশী। রসিক, যদিও রসটা নিজের মধ্যে রাখতেই ভালোবাসেন। এককালে খেলাধুলায় পারদর্শী ছিলেন, ইদানীং বয়সের ভারে ওদিকে যান না। রাজনীতিতে আগ্রহ না অনাগ্রহ বোঝা যায় না। চুপিচুপি আঁতেল বলা হয় (নিজস্ব সংবাদদাতা)।

তৃতীয় বর্ষ

অর্পণ চক্রবর্তী—বিষয় বাংলা—সব অর্থেই। কবিতা রক্ষিতা নয় তাই তাকে উপদ্রুত অন্ধকারে না রেখে চটজলদি হস্তান্তর করেছেন। বিশিষ্ট ভঙ্গীতে দূর দ্বীপবাসিনী নারীর উদ্দেশ্যে কবিতা পড়েন হোস্টেলে মাঝরাতে। শ্রোতাদের অভিযোগ জমেনা। সফল কবি কিনা জানা যায় না, তবে সফল ব্যবসায়ী।

সৌম্য ভট্টাচার্য্য—বিভাগীয় নবীনাদের কাছে প্রিয়। পাস্টটাইম-আলোচনা বিষয় সলজেনিৎসেন থেকে সোসাইটির সাম্প্রতিক সিনেমা। বাংলা কথ্যভাষায় ব্যুৎপত্তি আছে। ইংরেজী।

রাজর্ষি দাশগুপ্ত—চারমিনার স্পেশাল, পাওয়ার উইগুচিটার, ইঁটরঙা পাঞ্জাবী আর কপালের উপর নেমে আসা চুলে একে চেনা যায়। বহু নারীর হৃদস্পন্দন জাগিয়ে এখন সরস্বতীর সাধনায় অভিনিবিষ্ট। কাজকর্ম প্রমাণ করে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র এবং সংস্কৃতির প্রতিনিধি যার গতায়াত গণসঙ্গীত থেকে জে থ্রো টাল। কবিতা, নাটক এবং···শোলা কাটায় পারদর্শী।

প্রাক্তন ছাত্র

অচ্যুৎ মণ্ডল—সাত জার্মান জগাই একা তবুও জগাই লড়ে। প্রায় স্পার্টাকাসের সমকালীন গণআন্দোলন থেকে মণ্ডল বিরোধী মিছিলে ছিলেন, থাকবেন। আগে রাখতেন এখন দাড়ি সম্পর্কে বীতরাগ জন্মেছে। এই প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান বিরোধী আপাততঃ দেশেই আছেন। বাংলা।

অদ্রীশ বিশ্বাস—রবীন্দ্র জয়ন্তীতে প্রচুর লিটল ম্যাগ কেনেন। সাম্প্রতিক প্রবন্ধে তার প্রমাণ আছে। প্রাক্তন সম্পাদক। বর্তমানে মধুপানরত। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গে কিনা দেখা যাক। বাংলা

তথাগত চ্যাটার্জ্জী—হিরো বলতে যা বোঝায় ইনি অনেকটাই তাই। তবে ট্রাজিক না কমিক সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া মুশকিল। 'এত কাছে তবু এত দূরে' বাক্যটি তার ক্ষেত্রে ফিরে ফিরে আসে। তবে উল্টো-ভাবে কখনোই নয়। ক্যুইজ এবং ম্যাজিক অনুরাগী। অর্থনীতি। দিল্লীতে।

(১৯৮৯ সালের পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

বিবেক সেন—বেশী বোঝার বোঝাতে ন্যুব্জ। প্রাক্ বৈবাহিক প্রেম অসন্তোষ জনক, এখন প্রেমের অন্বেষণে সংসারী। চোখ খুলে দেখেন, মন খুলে ভাবেন, মুখ খুলে কথা বলেন, কান বন্ধ করে শোনেন। তার দরাজহাত প্রমাণ করে না তিনি অর্থনীতির ছাত্র।

যশোধরা রায়চৌধুরী—অদীর্ঘাঙ্গী, আধুনিকা, অমধ্যযুগীয় অথচ আমলা। আমলাবৃত্তি কি মধ্যযুগীয় নয়? গল্পটা ভালোই ফেঁদেছেন। দর্শন।

সুনন্দন রায়চৌধুরী—সার্ত্রের বই ভ্যানিটি ব্যাগের মতো দুলিয়ে যাতায়াত করতেন। বুদ্ধিজীবি এবং বিদগ্ধ। সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রসিদ্ধ ছিল তার প্রতীক্-রিয়া। আপাততঃ দিল্লীতে। গণতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক-শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নজীরবিহীন প্রতিনিধি।

ঈশানী দত্ত রায়—ক্ষুদ্র বাক্যবন্ধনে দীর্ঘ কবিতা রচনায় পটু। রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

With Best Compliments from :

THE PEERLESS GENERAL FINANCE & INVESTMENT CO. LTD

Regd. Office :
PEERLESS BHAVAN
3, Esplanade East; Calcutta-700 069
India's Largest Non-Banking Savings Company

With Best Compliments from :

M/s. Tirap Veneer & Saw Mills Limited

Manufacturers of A-I Quality Plywood
Boiling Water Resistant Plywood
Warm Water Resistant Plywood
Cold Water Resistant Plywood
Commercial Plywood
Regd. Office & Factory :
P. O. Miao
Dist. Changlang, Arunachal Pradesh
Calcutta Office :
15 India Exchance Place, 3rd Floor
Calcutta 700 001
Phone : 20-1368 /4107/4279

Space Donated By :

A
WELL
WISHER

With Best Compliments from :

"NEW RAJ"

89, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta-700007.
Makers of delicious Indian sweets

With Compliments from :

PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY
Bought
10 AUG 1992
CALCUTTA

Ambica Shipping
&
Industries Pvt Ltd

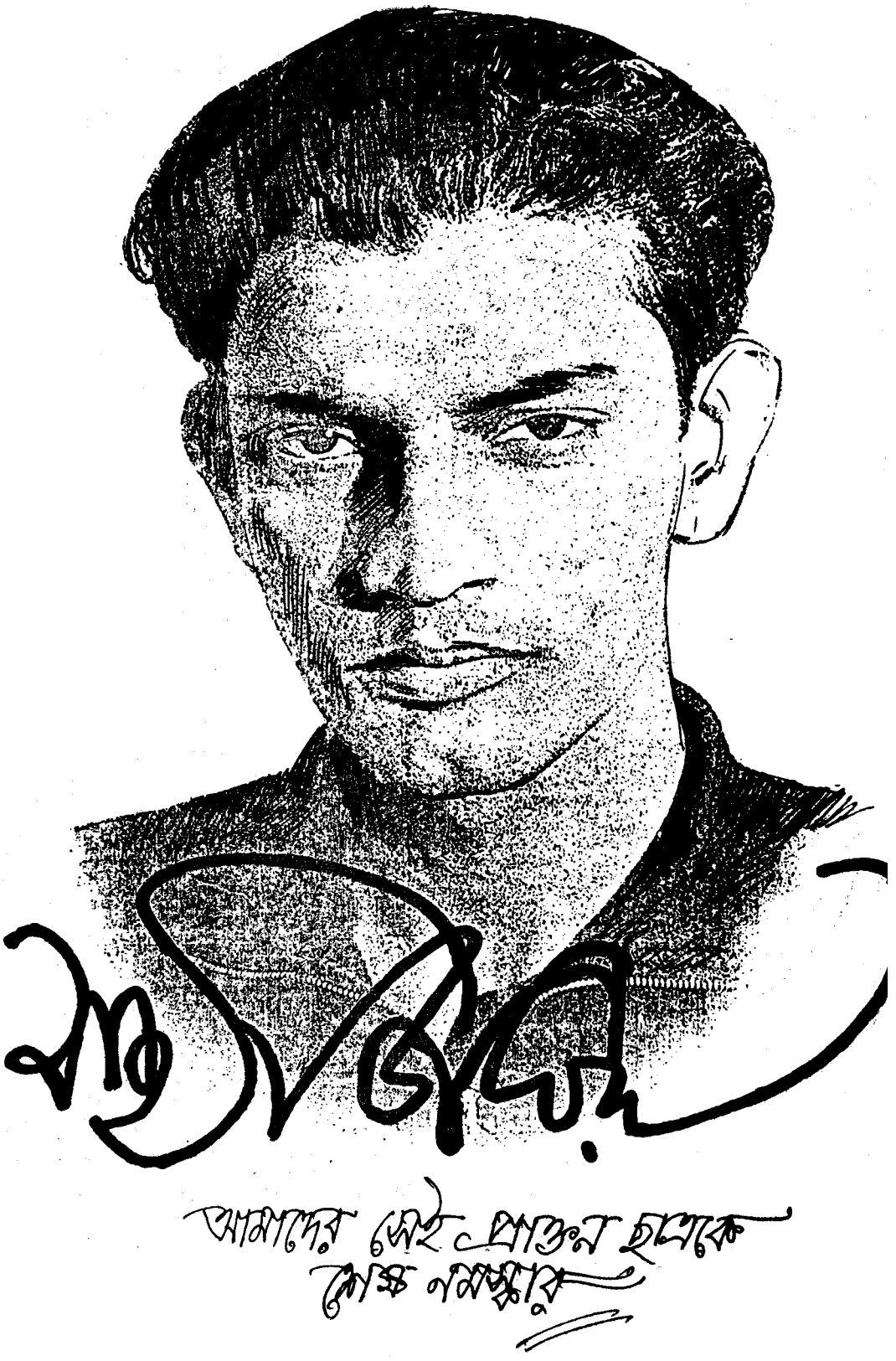
সত্যজিৎ রায়
আমাদের সেই প্রাক্তন ছাত্রকে
শ্রদ্ধা নমস্কার